বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

সেপ্টেম্বর ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

নিয়মিত

- জীবন জিজ্ঞাসা
- একনজরে গত মাস
- জানার আছে অনেক কিছু
- ক্যারিয়ার
- আবাবীল ফৌজ
- কবিতা
- চিঠিপত্র

এ সংখ্যায় রয়েছে...

- আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর বিশেষ প্রবন্ধ
- কাসীদায়ে বুরদা ও নবী প্রেমের উপহার
- নবী ﷺ : আরোপিত অপবাদ ও পণ্ডিতদের মূল্যায়ন
- আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতায় ফিরল তালেবান
- তালেবান নিয়ে কিছু কথা
- করোনাকালে শিক্ষা : শঙ্কার মাঝেই খুঁজি বিকল্প পথ
- শিশুর হাতে মোবাইল নয় বই দিন
- ভ্যাকসিনের ইতিহাস

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

২৮তম বর্ষ ■ ৯ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২১ ♦ভাদ্র-আশ্বিণ ১৪২৮ ♦ মহররম-সফর ১৪৪৩

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি
মিফতাহুল ইসলাম তালহা

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/ আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

বিশেষ প্রবন্ধ
আলী বিন হুসাইন হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.)
মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ০৫

শারহুল হাদীস
সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা/ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৮

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/ মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ১০

শানে রিসালাত
কাসীদায়ে বুরদা ও নবী প্রেমের উপহার/ মাওলানা মোহাম্মদ ছরওয়ারে জাহান ১৩
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: আরোপিত অপবাদ ও অমুসলিম পণ্ডিতদের মূল্যায়ন
মারজান আহমদ চৌধুরী ১৪

ফিকহ
ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা/ মো. মুহিবুর রহমান ১৮

আন্তর্জাতিক
আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতায় ফিরল তালেবান/ রহমান মুখলেস ২০

আলোকপাত
তালেবান নিয়ে কিছু কথা/ আবূ যাকওয়ান ২৩
আফগানিস্তানে পশ্চিমাদের পরাজয়: আমাদের দ্বিচারিতা/ হামিদ মাশহুর ২৪
করোনাকালে শিক্ষা : শঙ্কার মাঝেই খুঁজি বিকল্প / মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ২৫

সফরনামা
ভারত সফরে কয়েকদিন/ রূহুল আমীন খান ২৭

মসনবীর গল্প
ধর্মীয় বিদ্বেষ ও টেরাচোখ ছাত্র/ ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩০

আউলিয়া
সূফী নিয়ামাতুল্লাহ খাযা/ মুহাম্মাদ ইবন নূর ৩৬

ইতিহাস-ঐতিহ্য
মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপুরুষ/ হায়দার ইবনে মোকাররাম ৩৮

স্মরণ
মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.)/ আবু ছালেহ মো. নিজাম উদ্দীন ৪০

খাতুন
শিশুর হাতে মোবাইল নয় বই দিন/ সৈয়্যদা নাদিরা হোসেন ৪১

স্বাস্থ্য
ভ্যাকসিনের ইতিহাস/ মুমিনুল ইসলাম ৪৪

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৫
এক নজরে গত মাস ৪৯
জানার আছে অনেক কিছু ৫১
ক্যারিয়ার ৫২
কবিতা ৫৩
আবাবীল ফৌজ ৫৫
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

বিশ্বজুড়ে মানবসভ্যতার গতিপথ যেন আচমকা বদলে দিয়েছে করোনা মহামারী, থমকে দিয়েছে সকলের সাধারণ গতিবেগ। তবু থেমে নেই মানুষ, নতুন বাস্তবতা মেনেই জীবন যাপনের নতুন কৌশল খোঁজে নিচ্ছে সবাই। সেই সাথে করোনার প্রকোপ থেকে পরিত্রাণের আশায় চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম প্রচেষ্টা। লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা থেকে শুরু করে আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য টিকার ব্যবস্থা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সকল দেশ। এরই মধ্যে সাফল্যও আসতে শুরু করেছে। যে চীনে ২০১৯ সালে সর্ব প্রথম এই ভাইরাস দেখা গিয়েছিল, সেই চীন ইতোমধ্যে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশে করোনা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে লকডাউন জারি করলেও কোন দেশেই এক টানা পূর্ণাঙ্গ লকডাউন হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে সকল দেশেই লকডাউন শিথিল করতে হয়েছে বহুবার। উন্নত বিশ্বে লকডাউন শিথিলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে শিক্ষাখাতকে। তাই ২০২০ সাল থেকে এখন অবধি এক নাগাড়ে সেসব দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকেনি। বহু দেশে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আংশিক কিংবা পূর্ণরূপে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর থেকে টানা শিক্ষা প্রতিষ্টানসমূহ বন্ধ রয়েছে। অনলাইন ক্লাস ও অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে সীমিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করা হলেও কার্যত সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। নেটওয়ার্কের দুরবস্থা, উপযুক্ত ডিভাইসের অভাব ও সংশ্লিষ্টদের প্রযুক্তিতে অনভ্যস্থতার কারণে দেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী কার্যকর অনলাইন ক্লাসের আওতায়ই আসতে পারেনি। অন্যদিকে সীমিত সংখ্যক শহুরে শিক্ষার্থী ডিভাইস, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য সুবিধার আওতায় থাকার ফলে কিছু সংখ্যক অনলাইন ক্লাস করতে সক্ষম হলেও তাতে অনেকাংশে ফলাফল হীতে বিপরীত হয়েছে। বিশেষত শিশু-কিশোরদেরকে স্মার্টফোন ও এ জাতীয় ডিভাইস থেকে দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও অনলাইন ক্লাসের সুবাদে এসকল শিক্ষার্থীর ডিভাইস আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের ও অন্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মারাত্মক বৈষম্য, যা একটি দেশে কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

এদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য সকল প্রতিষ্ঠান সব ধরনের বাধা-নিষেধের আওতামুক্ত থাকার ফলে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণেও কোন সফলতা পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা এসকল শিক্ষার্থী ও তারা যাদের সংস্পর্শে নিয়মিত আসছে, তারা ঠিকই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকলে যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং অন্য সবকিছু খোলা থাকার ফলে অনেকক্ষেত্রে তারা আরো বেশি সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে করোনার ঝুঁকিতে পড়ছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় করোনা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন উপকার তো হচ্ছেই না, উপরন্তু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলাসহ বহুবিধ মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই যথাসম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ একাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় চালু করা উচিত।

আত্-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً– وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ– أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا. وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَٰذَا مَثَلًا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا– وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

অনুবাদঃ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। আমি আমার বান্দাহ'র প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আসো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো। যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং কখনো তা করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় করো, মানুষ ও পাথর হবে যার জ্বালানি, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত– যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হতো ইহা তা-ই, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো বস্তুর উপমা দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, আল্লাহ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পাপাচারীগণ ব্যতীত আর কাউকেই বিভ্রান্ত করেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১-২৬)

তাফসীর:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(اعْبُدُوا এর মর্মার্থ হবে) তোমরা সৃষ্টি জগতের সবকিছু বাদ দিয়ে এককভাবে তোমাদের রবের আনুগত্য ও ইবাদত করো। অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে লোকসকল! তোমরা সেই আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ যাতে তোমরা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে পারো এবং মুত্তাকী হতে পারো, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

অর্থাৎ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং চলাচলের জায়গা বানিয়েছেন এবং তার উপর তোমাদের অবস্থানের জায়গা তৈরি করেছেন।

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

'সামা' শব্দকে سماء নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে আসমান মাটি থেকে উর্ধ্বে। আর আসমানকে এর ছাদ বানানো হয়েছে। একটি বস্তুর উপর আর একটি বস্তু রাখা হলে উপরের বস্তুকে سماء বলে।[১] আল্লাহ আসমানকে যমীনের উপর গুম্বুজের আকৃতিতে ছাদ বানিয়েছেন।[২]

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

মহান আল্লাহ তাআলা আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই বৃষ্টি হতে তোমাদের রিযক হিসেবে বিভিন্ন ফল-মূল উৎপন্ন করেন। চাষাবাদ ও রোপণযোগ্য যে জমিগুলো ফসল উৎপন্ন করে সেগুলো শক্তি ও খাদ্য হওয়ার দিক থেকে তোমাদের জন্য রিযক।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَندَادًا

সুতরাং ইনসাফ এবং দৃষ্টান্তের দিক থেকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না। এর মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে উপমা বা সাদৃশ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকো।[৩]

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুশরিক ও আহলে কিতাব! তোমরা তো জানো আল্লাহ তাআলা একক, তাঁর কোনো শরীক ও সাদৃশ্য নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, (তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়- তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে তোমরা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ তাআলা।) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

-(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান এবং যমীন হতে কে রিযক দান করেছেন? কান আর চোখের মালিক কে? মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত কে করেন? কে সকল বিষয় পরিচালনা করছেন? এসব প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ! তাহলে [হে মুহাম্মদ ﷺ!] আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন- তবে কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করছ না?[৪]

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ হে কাফিরগণ! আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দিহান থাকো তাহলে এ কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো। প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্যকারীদের সাহায্য নিয়ে হলেও উপস্থাপন করো। 'মুহাম্মাদ ﷺ এই কুরআন নিজে বানিয়ে এনেছেন' তোমাদের এ দাবি ও ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো, সবাই মিলে একটি সূরা তৈরি করে আনো!

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনো করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের এ ধরনের সূরা প্রণয়ন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

সুতরাং তোমাদের উচিত সত্যকে মেনে নিয়ে দুযখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করা, যে আগুনের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

এটা কাফিরদের জন্য সদা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

-হে মুহাম্মদ ﷺ! ঐসব লোকদের সুসংবাদ দিন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। তাদের জন্য এমন উদ্যান বা বেহেশতের ব্যবস্থা রয়েছে, যার নিচ দিয়ে নাহ্‌র বা ঝরণাসমূহ প্রবাহমান।

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا

-যখনই তাদেরকে বেহেশতের ফলের মধ্য হতে রিযক দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে এটা তো ঐ রিযক, যে রিযক আমাদেরকে আগে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এটি পৃথিবীতেও দেওয়া হয়েছিল।[৫] একই ধরনের ফল বটে, কিন্তু স্বাদে ভিন্ন। অর্থাৎ জান্নাতবাসীকে যখন ফলের দ্বারা রিযক দেওয়া হবে, তখন তারা দেখে বলবে, এ ধরনের ফল দিয়েই আমাদেরকে দুনিয়াতে রিযক দেওয়া হয়েছিল। তবে এ সাদৃশ্য রঙ এবং খাদ্যের মধ্যে হবে, কিন্তু স্বাদে ভিন্ন হবে।[৬] অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, বেহেশতের কোনো ফল অপসারণ করা হলে, সেখানে ঐ ফলের মতো অন্য আরেকটি আনা হয়।[৭] وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهًا তাদেরকে অনুরূপ ফল দেওয়া হবে। এখানে অনুরূপ বা مُتَشَابِهًا শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে গুণগত মানে সাদৃশ্য হবে। অপর বর্ণনায় আছে, مُتَشَابِهًا অর্থাৎ সবগুলোই উত্তম ফল হবে। তাতে কোনো নিকৃষ্ট ফল নেই।[৮]

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ

যে সকল মুমিন নেক কাজ করে তাদের জন্য বেহেশতের মধ্যে পূত পবিত্র স্ত্রী রয়েছেন। এখানে أَزْوَاجٌ বহুবচন, যার একবচন হচ্ছে زَوْجٌ অর্থাৎ স্ত্রী আর مطهرة শব্দের ব্যাখ্যা হলো, এ সকল স্ত্রীগণ সকল ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও সন্দেহ হতে পবিত্র হবে। যেহেতু দুনিয়াতে মেয়েরা হায়িয, নিফাস, পায়খানা, পেশাব, বীর্য, থুথু এ ধরনের অনেক কিছু দ্বারা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু বেহেশতে এ সবকিছু থাকবে না।[৯]

আর কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে, হযরত হাওয়া (আ.) কে আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করার আগে পবিত্র বলা হয়েছিল, যেহেতু এর আগে তাঁর হায়িয হতো না। যেমন হাদীস শরীফে আছে, যখন তিনি আদেশ অমান্য করলেন, আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলাম। এখন তোমাকে রক্তাক্ত করব, যেমনি তুমি করেছ এই বৃক্ষকে।[১০]

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ

আর তারা চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে থাকবেন অর্থাৎ যে সকল ঈমানদার নেক কাজ করেন, তারা স্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবেন এবং সর্বদা তাদেরকে নিআমত দেওয়া হবে।

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

হযরত ইবন মাসঊদ (রা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুটি উদাহরণ দিলেন অর্থাৎ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي এবং أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ। তখন মুনাফিকগণ বলতে লাগল- আল্লাহ তাআলা এ ধরনের উদাহরণ দিতে পারেন না, যেহেতু তিনি এর থেকে অনেক উপরে। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا-[১১]

হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মাছির কথা এবং মাকড়সার কথা উল্লেখ করেন, তখন গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, ما اراد الله من ذكر هذا- এগুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা কী বুঝাতে চান? তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।[১২]

অর্থাৎ আল্লাহ যাদের জন্য এ উদাহরণ পেশ করেছেন, তারা মাছির মতো। কারণ মাছি যতক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে ততক্ষণ বেঁচে থাকে, আর যখন পেট পুরে খেয়ে ফেলে, তখন মারা যায়। তদ্রুপ এরা যখন দুনিয়াতে তৃপ্তি সহকারে ভোগ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংস করে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً যখন তারা দুনিয়াতে যা পেয়েছে তা নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে যায়, তখনই আকস্মিকভাবে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

استحياء শব্দের অর্থ লজ্জাবোধ আর এখানে خشية বা ভয় পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৩] অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা মাছি বা এর চেয়ে ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জিনিসের উদাহরণ দিতেও কোনো লজ্জাবোধ বা ভয় করেন না। মশা বা তার থেকে বড় কিছু দিয়ে উপমা দিতেও লজ্জাবোধ করেন না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَٰذَا مَثَلًا

সুতরাং যারা ঈমানদার তারা জানেন, এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্য। আর যারা কুফরী করে তারা বলে, এসব কিছুর উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা কী বুঝাতে চেয়েছেন? অর্থাৎ মুমিন এসব উদাহরণকে সত্য বলে মেনে নেয় ও বিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে কাফির বিশেষত আহলে কিতাব এবং মুনাফিকরা তা সত্য বলে জানার পরও বলে এসব উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন?

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

এসব উদাহরণের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেক লোককে গোমরাহ করেন, আবার অনেক লোককে হিদায়াত করেন। অর্থাৎ এ উদাহরণের দ্বারা মুনাফিক আর কাফিরদেরকে গোমরাহ করে দেন এবং অনেক বিশ্বাসী আর ঈমানদারকে হিদায়াত করেন। অর্থাৎ এর দ্বারা হিদায়াত এবং ঈমানের মধ্যে সমন্বয় হয়।[১৪]

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

এসব উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কেবল ফাসিক অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য, তাদেরকে গোমরাহ করেন।[১৫]

১. (তাবারী, ১/৩৮৮) ২. (তাবারী, ১/৩৮৯; তাফসীর ইবন আবী হাতিম, ১/৬১) ৩. (তাবারী, ১/৩৯০) ৪. (সূরা ইউনুস, আয়াত-৩১) ৫. (তাফসীর ইবন কাসীর, ১/৯০; তাবারী, ১/৪০৮) ৬. (তাবারী, ১/৪১০) ৭. (ইবন আবিদ দুনইয়া, সিফাতুল জান্নাহ, পৃ. ৪৯; তাবারী, ১/৪০৯) ৮. (তাবারী, ১/৪১২,৪১৩) ৯. (তাফসীর ইবন আবি হাতিম, ১/৬৭; তাবারী, ১/৪১৯) ১০. (তাফসীর ইবন কাসীর, ১/৯২; তাবারী, ১/৪১১) ১১. (তাবারী, ১/৪২৩) ১২. (ইবন কাসীর, ১/৯২; তাবারী, ১/৪২৪) ১৩. (তাবারী, ১/৪২৭) ১৪. (তাবারী, ১/৪৩৩) ১৫. (তাফসীর ইবন আবি হাতিম, ১/৭০; তাবারী, ১/৪৩৪)

আলী বিন হুসাইন হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.)

মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ + ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقَدَمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. (قصيدة برده)

১৯৬৫ ইংরেজি সনে হজ্জ ও যিয়ারত উপলক্ষে মদীনা মুনাওয়ারার 'জান্নাতুল বাকী' যিয়ারত করার সৌভাগ্য এ অধমের হয়েছিল। দেশ থেকে আমার পিতা ও মুরশিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব (র.) এর সাথে আমাদের কাফেলায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন আমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী, গুণী ও হৃদয়বান। কাফেলার প্রতিটি মানুষের বিবিধ অবস্থার কথা মনে পড়লে এখনও কিছুক্ষণের জন্য আমার কঠিন হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে, যদিও তাদের অনেকেই দুনিয়ার সফর শেষ করে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে কামনা করি তাদের দুনিয়ার সফর ছিল যেমন সুন্দর, পরপারের সফরটিও যেন তেমন হয়।

পান্থশালায় হেলায় খেলায় কাটাইনু সারা নিশি
পথের সাথীরা সবি চলে যায় রইনু একেলা বসি।

আমার জীবনের সফরের দিনগুলি একে একে শেষ হতে চলছে, অথচ আমি পাথেয়হীন অপরিণামদর্শী পথিকের মতো এক অজ্ঞাত পরিচয় কুহেলিকাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলছি। দয়াময় তোমার নেক বান্দাহগণের ওসীলায় খানিক দরদে-দিল দান কর, যেন দরদ পূর্ণ হৃদয়ের দাড় টেনে জীবন তরী খানা নিয়ে তোমার অপার প্রেম সিন্ধুতে নিজেকে বিলীন করতে পারি।

তোমার হাবীবের ওসীলায় প্রভূ ক্ষমা করে অধমেরে
পার করে তারে মরণের খেয়া নিয়ে যেও পরপারে ।

হজ্জের সময় কাফেলার নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে কোনো কোনো সময় আমি বিচরণ করতাম। কোন এক রজনীতে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান্তির নীড় মদীনা মুনাওয়ারায় উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখার সাধ জাগলো। 'জান্নাতুল বাকীর' এক কিনারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলাম, নীল আকাশে নক্ষত্র মিটি মিটি জ্বলছে। মনে পড়লো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে আকাশের তারার সাথে তুলনা করেছেন। চর্মচক্ষে পবিত্র মদীনার আকাশের তারার সৌন্দর্য ও কল্পনানেত্রে সাহাবায়ে কিরামের চরিত্র মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করলাম, প্রতিটি তারা তার সৌন্দর্যে আমার ব্যথিত হৃদয়ের অতৃপ্ত পিয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে সক্ষম। অতঃপর 'জান্নাতুল বাকীর' দিকে কাতর নয়নে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সোনার চেয়েও দামী, তারার চেয়েও উজ্জল, অগণিত অমূল্য রত্ন বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটি প্রান্তর। সেখানে কোনো দ্বন্ধ নেই, কোলাহল নেই, নিঝুম নিরালা রহমতি পরিবেশ।

এ প্রান্তরের এক কোণে গুরুগম্ভীর পরিবেশে হযরত ফাতিমা (রা.) আরাম করেছেন, হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.) ও আহলে বাইতের অনেককে নিয়ে। হযরত ফাতিমা (রা.) এর বুকের সব রত্ন একে একে বিলীন হয়ে গেল ফুরাতের তীরে, রক্তাক্ত কারবালার ময়দানে। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় বেঁচে রইলেন হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.)। হযরত ফাতিমা (রা.) স্নেহের দুলালকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন 'জান্নাতুল বাকীতে'।

বাল্যকালে আমার মা কারবালার সঠিক ইতিহাস ও ইমাম যাইনুল আবিদীন (রা.) এর ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। মায়ের মুখে শুনা ইতিহাসের কয়েকটি অশ্রুভেজা পাতা আজ স্মৃতির বিবর্তনী আয়নায় একে একে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ভাব বিহবল চিত্তে নিঝুম নিরালা পরিবেশে দাঁড়িয়ে মনে মনে সংকল্প করলাম ইমাম যাইনুল আবিদীন (রা.) এর একখানা জীবনী লিখব। আমার সে সংকল্প পূর্ণ হয়নি। একটি জীবনী লিখা সম্ভবপর হয়নি। হযরত ইমাম যাইনুল আবিদীন (রা.) এর জীবনের কিছু ঘটনা, তথ্য সংগ্রহ করে ছোট একখানা পুস্তক রচনা করলাম। আল্লাহ তাআলা যেন কবূল করেন। [এ লেখা সে ছোট পুস্তকের নির্বাচিত কিছু অংশ।]

হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.)

হযরত যাইনুল আবিদীন (রা.) এর আসল নাম আলী। ইবাদতে অত্যধিক নিমগ্ন থাকতেন বলে 'যাইনুল আবিদীন' নামে আখ্যায়িত হন। তিনি প্রত্যহ সহস্র রাকাআত নামায আদায় করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত এ অভ্যাস ছিল। (ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৫)

শুভ জন্ম ও শেষ বিদায়

ইমাম কাসতলানী প্রণীত 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' কিতাবের ব্যাখ্যাকার যুরকানী তাঁর শারহুল মাওয়াহিব (খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯) এ উল্লেখ করেছেন, আলী যাইনুল আবিদীন (রা.) বিন হুসাইন (রা.) বিন আলী (রা.) বিন আবূ তালিব হিজরী ৩৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'তাবিঈ' ছিলেন। ৯৪ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা-১১৩) এ উল্লেখ করেন, আলী ইবন হুসাইন (রা.) ৯৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাঈব, উরওয়া বিন যুবাইর, আবূ বকর বিন আব্দুর রহমানও ৯৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-৭৫) এ উল্লেখ করেছেন, যাইনুল আবিদীন (রা.) ৯৪ হিজরী সনে রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন খাল্লিকান তৎপ্রণীত ইতিহাস গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ২৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, যাইনুল আবিদীনের গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন 'তাবিঈ'। ৯৪ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতি মারফত আমরা সুনিশ্চিত যে, যাইনুল আবিদীন (রা.) ৩৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে মদীনা শরীফের 'জান্নাতুল বাকীতে' দাফন করা হয়।

পিতা ও মা-জননী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন (রা.) ছিলেন যাইনুল আবিদীনের পিতা। আর তাঁর মা ছিলেন গাযালা। ইমাম ইবন কাসীর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের ৯ম খণ্ডে ১০৪ পৃষ্ঠায় ইবন কুতাইবার বরাত দিয়ে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আহমদ বিন আবূ বকর বিন খাল্লিকান তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ২৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, পারস্যের সর্বশেষ সম্রাট يَزْدَجِرْدْ (ইয়াযদার্জিদ) এর কন্যা সুলাফা ছিলেন যাইনুল আবিদীনের মা।

তাই যাইনুল আবিদীনকে ابن الخيرتين -দুই উত্তমের ছেলে বলা হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে পারস্যের শেষ সম্রাট য়াজদাজির্দ এর পতনের পর তার তিন কন্যা মদীনা শরীফে আসেন এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করার উদ্দেশ্যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১. হুসাইন বিন আলী (রা.) ২. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) ও ৩. মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (রা.) তিন রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিন রাজকন্যার গর্ভে এমন তিনজন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেন যাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় ও অমর হয়ে আছে। ১. হুসাইন (রা.) এর পুত্র আলী যাইনুল আবিদীন ২. মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রা.) এর পুত্র কাসিম এবং ৩. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর পুত্র সালিম। যাইনুল আবিদীন (রা.), কাসিম (রা.) ও সালিম (রা.) একে অন্যের খালাতো ভাই ছিলেন।

ড. রাফাত পাশা লিখেছেন, হযরত যাইনুল আবিদীনের (রা.) আম্মার আসল নাম ছিল شاه زنان । তাকে আযাদ করা হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তার নাম রাখা হয় غزالة। সন্তানের জন্মের কিছুদিন পর আম্মা غزالة ইন্তিকাল করেন। (صور من حياة التابعين, পৃষ্ঠা-৩৩৯)

পারস্য রাজকন্যাগণ ছিলেন ভাগ্যবতী। তারা সবচেয়ে বড় দৌলত লাভ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণ করে। আর দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত আযাদ মহিলারূপে মহান ব্যক্তিদেরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

কারবালার ময়দানে

ইমাম ইবন কাসীর সনদ মাধ্যমে যাইনুল আবিদীন (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম যাইনুল আবিদীন (রা.) বলেন, যেদিন আমার পিতাকে শহীদ করা হয় তার পূর্বের রাত্রে (অসুস্থ অবস্থায়) উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ফুফু 'যাইনাব' আমার পরিচর্যা করছিলেন। এমন সময় আমার পিতা তাবুতে আলাদা কয়েকজন সঙ্গীসহ অবস্থান করছিলেন। আমার পিতা তখন একটি শোকগাঁথা পাঠ করছিলেন-

وَاِنَّمَا الْاَمْرُ اِلَى الْجَلِيْلِ – وَكُلُّ حَيّ سَالِكُ السَّبِيْلِ–
يَادَهْرُ اُفٍّ لَكَ مِنْ خَلِيْلِ – كَم لَكَ بِالْاِشْرَاقِ وَالْاَصِيْلِ–
مِنْ صَاحِبٍ اَوْ طَالِبٍ قَتِيْلِ – وَالدَّهْرُ لَايَقْنَعُ بِالْبَدِيْلِ–

"তুমি এমন এক বন্ধু যে বন্ধুর অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি অনুশোচনা করছি। সকাল সন্ধ্যা তোমার রূপ পরিবর্তনশীল। যামানা যা কিছু চায় তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণও করে না। সব বিষয়ের বাগডোর আল্লাহর হাতে। জীবিতমাত্রই পথচারী।"

যাইনুল আবিদীন (রা.) বলেন, দুই বার অথবা তিন বার আমার পিতা কবিতাটি পাঠ করলেন। আমি কবিতাটি মুখস্থ করলাম এবং বুঝতে পারলাম তার উদ্দেশ্য কী? (অর্থাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি শাহাদাত বরণ করবেন)।

অতঃপর কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসল। কতক্ষণ ক্রন্দনের পর নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলাম। বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপর বিপদ আসন্ন। আমার ফুফু যাইনাব হযরত হুসাইন (রা.) এর নিকট গিয়ে বললেন, আমার জননী ফাতিমা, পিতা আলী, ভাই হাসান সবাই মৃত্যু বরণ করলেন। ভাই, তুমি আমাদের শেষ ভরসা। বোনের খেদোক্তি শুনে ইমাম হুসাইন তাঁকে বললেন, হে আমার প্রিয় বোন! শয়তান তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না ঘটায়। অতঃপর যাইনাব বললেন, হে আবু আবদিল্লাহ (হুসাইন রা.)!, তুমি কি মরণকে আহবান করছো? এই বলে (যাইনাব) তাঁর চেহারায় চপেটাঘাত করতে লাগলেন এবং বস্ত্র ছিড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। হুসাইন (রা.) তাঁর নিকট এসে চেহারায় পানি ছিটালেন। অতঃপর বললেন, হে আমার প্রিয় বোন, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নাও।

তুমি সুনিশ্চিত জানো যে, জগৎবাসী সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। আকাশবাসীও থাকবে না। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত, যার অপার কুদরতের মহিমা এই সৃষ্টি। তিনি মৃত্যুদান করবেন, পুনরায় উঠাবেন। তিনি একক সত্য। হে প্রিয় বোন! তুমি জেনে রাখ, আমার পিতা, মাতা ও ভাই আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আমার জন্য, তাদের জন্য এবং সবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আদর্শ। অতঃপর তার হাত ধরে তাকে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। সঙ্গীগণকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন তাবুগুলি পরস্পর নিকটবর্তী করেন। যেন এক তাবুর কাঠ অন্য তাবুর সাথে সংলগ্ন থাকে। তাবুগুলি এমনভাবে পাশাপাশি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন যাতে সবদিক বন্ধ হয়ে যায় এবং দুশমনদের মুকাবিলার জন্য মাত্র একটি দিক খোলা থাকে। সারারাত হুসাইন (রা.) ও তার সঙ্গীগণ নামায ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল রইলেন। সারারাত আল্লাহর দরবারে আকুল কাঁদন কাঁদলেন। দুশমনের পাহারাদাররা পিছন দিকে ঘুরতেছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭)

ইমাম ইবন কাসীর (র.) বর্ণনা করেছেন, কারবালার ময়দানে হযরত আলী (রা.) এর সন্তানগণের মধ্যে যারা শাহাদত বরণ করেন তারা হলেন- ১. হযরত জাফর (রা.) ২. হুসাইন (রা.) ৩. আব্বাস ৪. মুহাম্মদ ৫. উসমান ৬. আবূ বকর। হযরত হুসাইন (রা.) এর সন্তানগণের মধ্যে শাহাদত বরণ করেন ১. আলী আকবর, ২. আব্দুল্লাহ। হযরত হাসান (রা.) এর সন্তানগণের মধ্যে শাহাদত বরণ করেন ১. আব্দুল্লাহ ২. কাসিম ৩. আবু বকর।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানগণের মধ্যে ২জন ১. আউন ২. মুহাম্মদ এবং আকিলের সন্তানগণের মধ্যে ১. জাফর ২. আব্দুল্লাহ ৩. আব্দুর রহমান ও ৪. মুসলিম শাহাদত বরণ করেন।

سلطان کربلا کو ھمارا سلام ہو
جانان مصطفی کو ھمارا سلام ہو

ইবন যিয়াদের সামনে

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর মধ্যে আছে, উমর বিন সা'দের নির্দেশ কারবালার ময়দান থেকে হযরত হুসাইন (রা.) এর পরিবার পরিজনকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে উঠানো হয় এবং পাহারাদারদের নিয়ন্ত্রণে কুফার শাসনকর্তা ইবন যিয়াদের নিকট প্রেরণ করা হয়। দুঃখে শোকে জর্জরিত মযলুম এই কাফেলা যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করার সময় হুসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণের লাশ দেখে উচ্চস্বরে রোদন আরম্ভ করেন। হুসাইন (রা.) এর প্রিয় বোন যাইনাব কাঁদতে কাঁদতে এক হৃদয় বিদারক শোকগাথা পাঠ করেন।

يَا مُحَمَّدَاهُ – يَا مُحَمَّدَاهُ – صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ
وَمَلَكُ السَّمَاءُ – هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ
مُزَّمِّلُ بِالدِّمَاءِ – مقطع الاعضاء – يا محمداه
وبناتك سبايا – وَذُرِّيَّتُكَ مقتلة–تَسْفِى عَلَيْهَا الصبا

-হে মুহাম্মদ ﷺ, আপনার উপর যেন রহমত বর্ষণ করেন, আল্লাহ তাআলা আকাশের মালিক। হুসাইন আজ বিজন প্রান্তরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত অবস্থায়, রক্তাক্ত দেহে নিক্ষিপ্ত।

হে মুহাম্মদ ﷺ, আপনার হেরেমের মেয়েরা আজ বন্দিনী, আপনার সন্তানগণ নিহত, প্রভাত সমীর এই নিদারুণ অবস্থার জন্য ব্যথিত।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, এই মর্ম বিদারী বাণী শুনে আপনজন ও দুশমন সকলেই কাঁদলেন।

ইয়াযীদ বাহিনীর পাহারাদারগণ তাদেরকে ইবন যিয়াদের নিকট নিয়ে গেল। ইবন যিয়াদ হযরত আলী বিন হুসাইন যাইনুল আবিদীনকে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল। ইবন যিয়াদ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী?

যাইনুল আবিদীন উত্তর দিলেন, আমার নাম আলী বিন হুসাইন।

ইবন যিয়াদ বলল, আল্লাহ তাআলা কি আলী বিন হুসাইনকে খতম করেননি? যাইনুল আবিদীন (রা.) নিশ্চুপ রইলেন।

ইবন যিয়াদ বলল, কেন তুমি নিশ্চুপ রইলে?

যাইনুল আবিদীন বললেন, আমার এক সহোদর ছিলেন তাকেও আলী বলা হতো। লোকেরা তাকে হত্যা করেছে।

ইবন যিয়াদ বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে কতল করেছেন।

যাইনুল আবিদীন: নিরুত্তর রইলেন।

ইবন যিয়াদ বলল, কেন কথা বলছো না?

যাইনুল আবিদীন তিলাওয়াত করলেন,اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا -আল্লাহ আত্মাসমুহকে কবয করে থাকেন তাদের মৃত্যুকালে। (সূরা যুমার, আয়াত-৪২)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ -আর কারো মৃত্যু আসা সম্ভব নয়, আল্লাহর আদেশ ব্যতিত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫)

তারপর ইবন যিয়াদ নির্দেশ দিল, যাইনুল আবিদীনকে নিয়ে দেখ 'সাবালক' কি না? ইবন যিয়াদের নির্দেশে মারী বিন মুআয আল আহমারী নামক এক ব্যক্তি যাইনুল আবিদীনকে নিরীক্ষণ করে বলল তিনি 'সাবালক'। ইবন যিয়াদ তখন যাইনুল আবিদীন (রা.) কে হত্যা করার নির্দেশ দিল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শ্রবণ করে যাইনুল আবিদীন বললেন, এই মেয়েলোকগণকে কার যিম্মায় সোপর্দ করা হবে?

যাইনুল আবিদীনের ফুফু যাইনাব তাকে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর ইবন যিয়াদকে সম্বোধন করে বললেন 'তোমার জন্য কি তা যথেষ্ট নয় যা কিছু আমাদের সাথে করেছো। তোমার সামনে কি আমাদের রক্তের প্রদর্শনী হয়নি? আমাদের মধ্য থেকে কি একজনকেও জীবিত রাখবে না?' পুনরায় যাইনাব যাইনুল আবিদীনকে বুকে আঁকড়ে ধরে বললেন, হে ইবন যিয়াদ! যদি তোমার ও এই মহিলাদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীগত সম্পর্ক থাকে, তবে তাদের সাথে এমন একজন লোক প্রেরণ কর যে ব্যক্তি খোদাভীরু এবং একজন মুসলমান সহচরের আচরণ করে। ইবন যিয়াদ তখন মহিলাদের দিকে একবার ও তার লোকজনের প্রতি একবার তাকিয়ে বললো, রক্ত সম্পর্ক এমন বিস্ময়কর বস্তু, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যদি আমি যাইনুল আবিদীনকে হত্যা করতাম তবে তার ফুফু যাইনাব তার সাথে স্বেচ্ছায় নিহত হওয়াকে পছন্দ করতেন।

তারপর ইবন যিয়াদ বলল, ছেলেটিকে তার মেয়েলোকদের সাথে রেখে দাও। ইবন যিয়াদ মহিলাগণকে ও যাইনুল আবিদীনকে মুহকার বিন সালাবা ও শিমর বিন যুলজাওশনের নিয়ন্ত্রণে ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করল। যাইনুল আবিদীনের পবিত্র গর্দানে তৌক লটকিয়ে রাখার নির্দেশ দিল। ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত হলে ইয়াযীদ যাইনুল আবিদীনকে সম্বোধন করে বলল, তোমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। আমার অধিকার খর্ব করতেও চেয়েছিলেন। এখন আল্লাহ তাআলা কী করেছেন তা তুমি দেখছো। যাইনুল আবিদীন তখন কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

-পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে বিপদ আসে তা এক বিশেষ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২২)

অতঃপর ইয়াযীদ তাদেরকে সসম্মানে বসাল। যাইনুল আবিদীনের ফুফু ফাতিমা বলেন, এমন সময় শাম দেশের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! এই মেয়েলোকটি আমাকে দান করুন। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার বোন যাইনাবকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি মনে করলাম যে এটি তাদের মতে জায়িয। যাইনাব আমার চেয়ে বয়সে ও জ্ঞানে বড় ছিলেন। তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মিথ্যাবাদী দুরাচার, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, এই মেয়ে তোর নয়, ওরও নয়। অর্থাৎ ইয়াযীদেরও নয়। ইয়াযীদ তৎশ্রবণে রোষান্বিত হয়ে বলল, নিশ্চয় আমার। যদি আমি চাই তবে অবশ্যই পারব। যাইনাব তখন বললেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই তুই পারবে না, যতক্ষণ না আমাদের ধর্ম হতে বের হয়ে অন্য ধর্ম অবলম্বন করবে।

ইয়াযীদ অধিক উত্তেজিত হয়ে বলল, তোমার ভাই ও পিতা এই দ্বীন থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। যাইনাব তখন বললেন, আল্লাহর দ্বীন, আমার পিতার দ্বীন, আমার ভাইয়ের দ্বীন ও আমার নানার দ্বীন দ্বারা তুমি, তোমার পিতা ও পিতামহ হিদায়াতের পথে এসেছিলেন। ইয়াযীদ তখন বলল, হে আল্লাহর দুশমন! মিথ্যা বলতেছ। যাইনাব তখন বললেন, তুমি আমীরুল মুমিনীন হয়ে যুলুম করছো। অবশেষে ইয়াযীদ লজ্জিত হয়ে নীরব হলো। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৯৩)

ইমাম ইবন কাসীরের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত যাইনুল আবিদীনের সাথে তার ছোট এক ভাই ছিলেন তার নাম উমর। উমর তখন ছোট বালক। ইয়াযীদ তামাসাচ্ছলে উমর বিন হুসাইন (রা.) কে বলল, তুমি ইয়াযীদের পুত্র খালিদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। উমর ইয়াযীদের কথা শুনে বললেন, ওর হাতে একটি ছুরিকা ও আমার হাতে একটি ছুরিকা দাও, তখন আমরা যুদ্ধ করব। ইয়াযীদ তা শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সর্প সর্পকেই জন্ম দেয়।

গোপন সাদকা

আবূ নুআইম তাঁর প্রণীত 'হুলিয়াতুল আউলিয়া কিতাবের ৩য় খণ্ড, ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠায় সনদসহ ও ইমাম ইবন কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে ৯ম খণ্ডে যাইনুল আবিদীন (রা.) সম্পর্কে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম।

(১) যাইনুল আবিদীন (রা.) রাত্রিকালে রুটির থলে নিজ পিঠে বহন করতেন এবং তা সদকা করতেন।

(২) তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই গোপন সাদকা আল্লাহ তাআলার গযবকে ঠাণ্ডা করে দেয়।

(৩) মদীনা শরীফে এমন এক শ্রেণির নিঃসহায় লোক ছিল যারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করত, অথচ তারা জানত না যে, তাদের খাদ্য সংস্থান কে করেন। আলী বিন হুসাইন (রা.) রাত্রিকালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অসহায় লোকদের খাদ্য সরবরাহ করতেন।

(৪) যাইনুল আবিদীনের ইন্তিকালের পর দেখা গেল যে, মদীনা শরীফে এমন একশটি পরিবার ছিল যাদের ভরণ পোষণকারী ছিলেন যাইনুল আবিদীন (রা.)।

(৫) মদীনাবাসী পরস্পর আলোচনা করতেন যে, আলী বিন হুসাইন যাইনুল আবিদীন যত দিন ছিলেন ততদিন আমরা গোপন সাদকা হারাইনি।

(৬) কোনো প্রার্থীকে দান করার সময় জিনিষটিতে তিনি চুম্বন করতেন।

(৭) মুহাম্মদ বিন উসামা বিন যায়িদ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। যাইনুল আবিদীন তার কাছে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদ বিন উসামা তাকে দেখে রোদন আরম্ভ করলেন। যাইনুল আবিদীন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি কাঁদছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি ঋণের জন্য কাঁদছি। জিজ্ঞাসা করলেন? ঋণের পরিমাণ কত? উত্তর দিলেন, পনের হাজার বা সতের হাজার দিরহাম। যাইনুল আবিদীন (রা.) বললেন, ঋণের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার আমার উপর। এই ঋণ আমি পরিশোধ করব।

(৮) আলী বিন হুসাইন (রা.) মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতেন, তাঁর উটটিকে একবারও প্রহার করতেন না।

(৯) তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা যা দান করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকে সেই সবচেয়ে ধনী।

(১০) আবূ হামযা বলেন, আমি আলী বিন হুসাইন যাইনুল আবিদীনের সমীপে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তার আশেপাশে কয়েকটি চড়ুই পাখি উড়ছিল এবং চেঁচামেচি করছিল। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবূ হামযা! পাখিগুলো কি বলছে, তা তুমি বুঝতেছ না? আমি উত্তরে বললাম, না। তখন তিনি বললেন, পাখিরা তাদের প্রতিপালকের গুণগান করছে এবং অদ্যকার প্রয়োজন মিটাবার মতো খাদ্য প্রার্থনা করছে।

মুহাম্মদ বাকির আবূ জাফর বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা আলী বিন হুসাইন (রা.) আল্লাহর ওয়াস্তে তার সমস্ত মাল সম্পদ দুইবার বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ". رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ আবদিল্লাহ নু'মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে বহু মানুষ জানে না। এমতাবস্থায় যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দ্বীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হবে সে (অচিরেই) হারামের মধ্যেও লিপ্ত হবে। যেমন কোনো রাখাল যদি নিষিদ্ধ সীমানার আশে-পাশে পশু চরায়, হতে পারে তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহর চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা হলো তার হারামসমূহ। জেনে রাখো, মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সারা দেহ সঠিক থাকে আর এটি বিনষ্ট হলে সারা দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই মাংসপিণ্ড হলো কলব-অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরীআতের বিধানসমূহের সারকথা তুলে ধরেছেন। শরীআতের বিধানসমূহ তিন প্রকার: ১. হালাল হিসেবে সুস্পষ্ট, ২. হারাম হিসেবে সুস্পষ্ট, ৩. সন্দেহযুক্ত অর্থাৎ তা হালাল না হারাম এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এ হাদীসের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র সকল কিছু সংশোধনের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। সকল ক্ষেত্রে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা এটি দ্বীন ও ইযযত-সম্মান রক্ষার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্দেহজনক বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন এবং 'হিমা' তথা রাজা-বাদশাহর নিষিদ্ধ সীমারেখার উদাহরণ টেনে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করেছেন। এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তা হলো, কলবের প্রতি খেয়াল রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً... (জেনে রাখো, মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে...)। এখানে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কলব তথা অন্তরের সংশোধনের মাধ্যমে সারা শরীর সংশোধিত হয়ে যায় এবং অন্তর বিনষ্ট হয়ে গেলে সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়। (শরহু মুসলিম)

হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ -নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট। অর্থাৎ শরীআতের কিছু বিধান এমন রয়েছে যেগুলো হালাল হিসেবে সুস্পষ্ট। আবার কিছু বিধান এমন রয়েছে যেগুলো হারাম হিসেবে সুস্পষ্ট। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এগুলোর হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

শাইখ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আল আনসারী বলেন, যে বিষয় হালাল হওয়া সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর দলীল আছে, অথবা যে বিষয় হালাল হওয়ার বিষয়ে মুসলমানগণ একমত অথবা যে বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তা হালাল। আর যে বিষয় হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর দলীল আছে, অথবা যে বিষয় হারাম হওয়ার বিষয়ে মুসলমানগণ একমত অথবা যে বিষয়ে কোনো দণ্ড, শাস্তি, কিংবা শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে তা হারাম। (শরহুল আরবাঈন)

আল্লামা ইবন বাত্তাল (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলা যেগুলো হালাল বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো الحلال البيّن (সুস্পষ্ট হালাল)। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (আজ তোমাদের জন্য সকল ভালো জিনিস হালাল করা হলো এবং যাদের কিতাব দান করা হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল করা হলো), وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (আর আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন), যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম তাদের তালিকা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ (এছাড়া অন্য নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হলো) ইত্যাদি। আর যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা হারাম বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো الحرام البيّن (সুস্পষ্ট হারাম)। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে...), وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে), قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (আপনি বলুন, আসো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা তোমাদের কাছে তিলাওয়াত

করি, তা হচ্ছে, তোমরা শিরক করবে না...) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যে সকল বিষয়ে আল্লাহ কোনো দণ্ড বা শাস্তি নির্ধারণ করেছেন কিংবা শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন সেগুলো হারাম। যেমন, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করা ইত্যাদি। (শরহু সহীহিল বুখারী)

কিছু বিষয় সন্দেহযুক্ত

সুস্পষ্ট হালাল ও হারামের মধ্যে কিছু বিষয় সন্দেহযুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ মানুষ এগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে مُشْتَبِهَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এগুলো হালাল না হারাম তা সুস্পষ্ট নয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ এগুলো পরিচয় করতে পারে না, এগুলোর হুকুমও জানে না। তবে মুজতাহিদ উলামায়ে কিরাম নস তথা কুরআন-সুন্নাহ'র দলীল, কিয়াস, ইস্তিসহাব কিংবা অন্যান্য বিষয়াদির দ্বারা এগুলো পরিচয় করতে পারেন। যখন কোনো বিষয় হালাল ও হারাম উভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত হয় এবং এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র কোনো দলীল কিংবা ইজমা না থাকে তখন মুজতাহিদ শরঈ দলীলের আলোকে সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে কোনো একটি হুকুম সাব্যস্ত করেন। মুজতাহিদ বিষয়টিকে হালাল সাব্যস্ত করলেও তার দলীল সন্দেহমুক্ত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকওয়ার দাবি হলো বিষয়টি পরিত্যাগ করা। এটি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরবর্তী উক্তি- فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দ্বীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ... আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়টি মুজতাহিদের নিকট সুস্পষ্ট হয়নি এর হুকুম কী হবে এ বিষয়ে চারটি মত রয়েছে। প্রথম ও বিশুদ্ধ মত হলো, এ বিষয়ে হালাল, হারাম, মুবাহ কিংবা অন্য কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না। কেননা, হকপন্থী উলামায়ে কিরামের মতে শরঈ দলীল ছাড়া কাউকে কোনো বিষয়ে বাধ্য করা যায় না। দ্বিতীয় মত হলো, বিষয়টি হারাম বলে গণ্য হবে। তৃতীয় মত হলো, বিষয়টি মুবাহ বলে গণ্য হবে। চতুর্থ মত হলো, এ বিষয়ে তাওয়াক্কুফ করতে হবে। (শরহু মুসলিম লিন নববী)

সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দ্বীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হবে সে (অচিরেই) হারামের মধ্যেও লিপ্ত হবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি হারামকে আল্লাহর 'নিষিদ্ধ চারণভূমি' উল্লেখ করে বলেছেন, প্রত্যেক বাদশাহ'র কিছু নিষিদ্ধ এলাকা বা চারণভূমি থাকে। আরবে আগে এর প্রচলন ছিলো। বর্তমান রাজা-বাদশাহদের ক্ষেত্রেও এরূপ বিষয়াদি রয়েছে। আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা বা চারণভূমি হলো তার নির্ধারিত হারামসমূহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, "কোনো রাখাল যদি নিষিদ্ধ সীমানার আশে-পাশে পশু চরায়, হতে পারে তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে।" এ উদাহরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। বিবেকবান যে কোনো মানুষই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং এ হাদীসের আলোকে আপন দীন ও ইযযত-সম্মান নিরাপদ রাখা ও হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম।

আল্লামা তকী উসমানী বলেন, নবী করীম ﷺ এ হাদীসে সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি পরিহার করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অবস্থাভেদে কখনো وُجُوْبِيْ তথা অত্যাবশ্যকীয়, আবার কখনো اِسْتِحْبَابِيْ বা মুস্তাহাব জাতীয় হয়। যেমন মনে করা যেতে পারে, একজন আলিম বা মুজতাহিদ কোনো বস্তু সম্পর্কে তাহকীক করছেন যে, বস্তুটি হালাল না হারাম? দলীল-আদিল্লা পর্যালোচনা করে দেখা গেলো, উভয় দিকেই দলীল বিদ্যমান রয়েছে। কিছু দলীল বস্তুটি হালাল বলে প্রমাণ করছে। আবার অন্য অনেক দলীল হারাম হওয়ার নির্দেশ করছে। উভয় প্রকার দলীল বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখা গেল ওজন ও শক্তির বিচারেও উভয়ই সমান সমান। কোনো দিককে প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বস্তুটি مُشْتَبَه (সন্দেহযুক্ত) বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বর্ণিত পরিস্থিতিতে উক্ত আলিম-মুজতাহিদকে হারামের দিক প্রাধান্য দিয়ে বস্তুটিকে অবৈধ ও হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। এ অবস্থায় উক্ত مُشْتَبَه বস্তু পরিহার করার হুকুম وُجُوْبِيْ বা অত্যাবশ্যকীয়।

অথবা, একজন সাধারণ মানুষ একটি বিষয়ে দুজন আলিম থেকে ফাতওয়া চেয়েছেন। একজন জায়িয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, অপরজন নাজায়িয। এখন যদি সে ব্যক্তি দু'আলিমের জ্ঞান ও তাকওয়ার বিচারে যে কোনো একজনের প্রতি অধিক আস্থাবান হন তাহলে তাকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উক্ত আলিমের ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে তার দৃষ্টিতে ইলম ও তাকওয়ার বিচারে উভয় আলিম সমান। তাহলে তাকে নাজায়িযের উপর আমল করতে হবে। কেননা বর্ণিত অবস্থায় বিষয়টি مُشْتَبِهَاتٌ এর অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

আবার কখনো কখনো مُشْتَبِهَاتٌ (সন্দেহযুক্ত বিষয়টি) থেকে বেঁচে থাকার হুকুম اِسْتِحْبَابِيْ বা মুস্তাহাব জাতীয় হয়। যেমন কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে এমন হয় যে, সেটি হালাল হারাম, উভয় দিকেই পরস্পর বিরোধী দলীল বিদ্যমান থাকে। তবে হালাল হওয়ার দলীলটি তুলনামূলক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় একজন আলিমের দায়িত্ব হলো তিনি বৈধতার দলীল রাজিহ তথা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও মজবুত হওয়ার ভিত্তিতে বিষয়টিকে হালাল বলে ফাতওয়া দিবেন। কিন্তু অপরপক্ষে যেহেতু অবৈধতার দলীলও বিদ্যমান তাই বিষয়টি এখন مُشْتَبَه বলে গণ্য হবে। এমন مُشْتَبَه থেকে বেঁচে থাকার হুকুম اِسْتِحْبَابِيْ বা মুস্তাহাব। সুতরাং তাকওয়ার দাবি হলো তা পরিহার করে চলা। (দরসে তিরমিযী)

প্রয়োজন কলব সংশোধন করা

যে কোনো সন্দেহ-সংশয়, হারাম ও গুনাহ'র কাজ থেকে বাঁচতে হলে প্রথমেই নিজের কলব বা অন্তরকে সংশোধন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে مُضْغَة (মুদগাহ) শব্দ দ্বারা কলবকেই উদ্দেশ্য করেছেন। মানুষের দেহের তুলনায় কলব অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ, তাই একে مُضْغَة (একটুকরো মাংস) বলা হয়েছে। কলব বা অন্তর হলো শরীরের চালিকা শক্তি। এটি যেন শরীরের রাজা। আর বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো এর প্রজা। এটি সংশোধন হয়ে গেলে বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংশোধন হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্তরের পরিশুদ্ধিতার উপরই সারা শরীর তথা একজন মানুষের পরিশুদ্ধি নির্ভর করে। অন্তর বিনষ্ট হলে সারা শরীর তথা পূর্ণ মানুষই বিনষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল। এটি কখনো ভালো কখনো মন্দের দিকে আবর্তিত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করতেন: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো)।

শেষকথা

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, দীনের হিফাযতের জন্য সুস্পষ্ট হালাল ও সুস্পষ্ট হারাম মেনে চলার পাশাপাশি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি কলব তথা অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। কেননা এর উপর সারা শরীরের সংশোধন কিংবা বিনষ্ট হওয়া নির্ভর করে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বনী উমাইয়ার হুকুমত ও হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) শহীদ হওয়ার পর হযরত হাসান (রা.) এর হাতে ইরাকবাসীগণ খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। ছয় মাস পর হযরত হাসান (রা.) খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করেন। এভাবেই রাসূল ﷺ উক্তি الخلافة من بعدى ثلاثون سنة (আমার পরে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত) বাস্তবায়িত হয়। পূর্ববর্তী চার খলীফার খিলাফতকাল যোগ করলে উনত্রিশ বছর ছয় মাস হয়। আর হযরত হাসান (রা.) এর খিলাফতকাল ছয় মাস যোগ করলে পূর্ণ ত্রিশ বছর হয়। হযরত হাসান (রা.) এর খিলাফত ত্যাগ করার পর থেকে প্রায় ষাট বছর উমাইয়া সুলতানগণ এবং তাদের আমীরগণ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলীকে গালমন্দ করার মন্দ প্রথা চালু রাখে। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.) কে গালমন্দকারীদের মধ্যে মারওয়ান অন্যতম। মুআবিয়া (রা.) এর দীর্ঘ হুকুমতকালে মারওয়ান কয়েকবার মদীনার গভর্ণর পদে বহাল হয়। আবার পদচ্যুত হয়। এ সময় প্রতি জুমুআবারে মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.) কে গালমন্দ করতো। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রা.) খলীফা হওয়ার পর এ প্রথা বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। তিনি সকল দায়িত্বশীল কর্মচারীর কাছে এ মর্মে ফরমান প্রেরণ করেন যে, তারা যেন হযরত আলীকে গালমন্দ করার বদলে কুরআনের এ আয়াতটি খুতবায় পড়েন-

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

এছাড়াও হযরত উমর বিন আবদুল আযীয অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো- 'ফাদাক' নামে খাইবারে একটি গ্রাম ছিল, যার আয় আহলে বাইতের জন্য খরচ হতো। খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় পর্যন্ত এভাবে ছিল। মুআবিয়া (রা.) এর সময় মারওয়ান এ গ্রামটি আত্মসাৎ করে ফেলে। এরপর থেকে এ গ্রাম মারওয়ান ও তার সন্তানদের জায়গীর হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয এ সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

মারওয়ান উমাইয়া বংশের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কারণ উমাইয়া হুকুমত প্রতিষ্ঠায় সবরকম চেষ্টা মারওয়ান করেছিল। তার অঘটনবহুল জীবনের কয়েকটি মারাত্মক ঘটনার মাধ্যমে সে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, যা সকল কিতাবে আছে। 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' এর মধ্যে আছে,

وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي ﷺ، وإنما أسلم يوم الفتح، وقدم الحكم المدينة ثم طرده النبي ﷺ إلى الطائف ومات بها. ومروان كان أكبر الأسباب فى حصار عثمان لأنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوفد، ولما كان متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر. وقال له الحسن بن علي: لقد لعن الله أباك الحكم وأنت فى صلبه على لسان نبيه فقال: لعن الله الحكم وما ولد والله أعلم.

-মারওয়ানের পিতা হাকাম রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে বড় শত্রুদের মধ্যে একজন ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় আসে। অতঃপর রাসূল ﷺ হাকামকে তায়িফে তাড়িয়ে দেন। হাকাম সেখানেই মারা যায়। আর মারওয়ান বিদ্রোহী কর্তৃক হযরত উসমান (রা.) এর বাড়ি ঘেরাও করার প্রধান কারণ ছিল। কেননা নিজের পক্ষ থেকে উসমান (রা.) এর নামে একখানা পত্র মিশর পাঠিয়েছিল, যাতে প্রতিনিধি দলকে হত্যার নির্দেশ ছিল। মুআবিয়া (রা.) এর আমলে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর ছিল তখন প্রতি জুমুআবারে মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.) কে গালি দিত। একদিন হযরত হাসান (রা.) বললেন, তোমার পিতা হাকামকে আল্লাহ তাঁর নবীর যবানে লা'নত করেছেন আর তুমি তার ঔরসজাত। আল্লাহর নবী বলেছেন, হাকাম ও তার আওলাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। (আল বিদায়া নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৪)

মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান (র.) এর 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থে আছে, হাকাম মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করত। রাসূল ﷺ তাকে সপরিবারে তায়িফে নির্বাসিত করেন। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠা- ১৮৯)

আল্লামা যাহাবী লিখেছেন, মারওয়ানের কর্মকাণ্ড ধ্বংসাত্মক। সে হযরত তালহা (রা.) কে হত্যা করেছে এবং আরো অনেক মন্দ কাজ করেছে। (মীযানুল ইতিদাল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬১)

তাহযীরুল আবকারী কিতাবে মারওয়ানের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা এক জায়গায় সংক্ষিপ্তভাবে জমা করা হয়েছে। এতে মারওয়ানের ধোঁকাবাজী ও ওয়াদাভঙ্গের ঘটনাও উল্লেখ আছে, যা দাহহাক বিন কাইসের সাথে করেছিল। দাহহাক বিন কাইসকে আশিজন সঙ্গীসহ মারওয়ান হত্যা করিয়েছিল।

'আনওয়ারুল বারী' এর মধ্যে আছে, মারওয়ানের পিতা হাকাম বড়ই অপকর্মকারী ছিল। সে রাসূল ﷺ এর আযওয়াজে মুতাহারাত এর হুজরায় গুপ্তচরের কাজ করত। হুজরার বাইরে থেকে কান পেতে হুজরার ভিতরের কথাবার্তা শুনার চেষ্টা করত এবং তা লোক সমাজে প্রকাশ করত। এজন্য রাসূল ﷺ হাকামকে এবং হাকামের পুত্র মারওয়ানকে পাক মদীনা থেকে নির্বাসিত করে তায়িফ পাঠিয়ে দেন। (আনওয়ারুল বারী শরহে বুখারী, উর্দু, পৃষ্ঠা- ১৫২)

হাকাম তায়িফে নির্বাসিত থাকাকালে মারা যায়। হযরত উসমান তাঁর খিলাফতকালে মারওয়ানকে মদীনায় নিয়ে আসেন। তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে এ বিষয়ে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর খিলাফতকালে মারওয়ান মদীনায় প্রবেশ করতে পারেনি। হযরত উসমান (রা.) মারওয়ানকে খিলাফতের দপ্তরে উচ্চ পদে বহাল করেন। তিনি যখন মারওয়ানকে চাকুরী দেন তখনও মারওয়ানের কোনো দুষ্কর্ম প্রকাশ পায়নি। পরবর্তীতে তার চিঠি জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ে। হযরত তালহা (রা.) কে হত্যা এবং মসজিদে নববীর মিম্বরে হযরত আলীকে গালমন্দ করা, ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের আগে আনা এসব উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পরের ঘটনা।

মারওয়ানের চিঠি জালিয়াতির ঘটনা ও উসমান (রা.) এর শাহাদাত

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে একবার মিশর থেকে কিছু লোক মদীনায় এসে মিশরের গভর্ণর আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারহ এর যুলম অত্যাচারের অভিযোগ করল। আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা.) ইবন আবি সারহকে ধমক দিয়ে ফরমান পাঠালেন। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ ভবিষ্যত সতর্কতা অবলম্বন করার পরিবর্তে অভিযোগকারীদের বেদম মারপিঠ করলেন। এমনকি এতে একজন লোক নিহত হয়ে গেল। তারপর মিশর থেকে প্রায় সাতশত লোক মদীনায় আসলো এবং ইবন আবি সারহ এর যুলুমের বিবরণ প্রকাশ করল। হযরত উসমান (রা.) তখন হযরত আলী (রা.) কে ডেকে আনলেন এবং বললেন, আপনি এ দলটিকে সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে দিন। আমি তাদের সকল ন্যায্য দাবি মানতে রাজি আছি। আমি বনী উমাইয়ার পক্ষপাতিত্ব করব না। মারওয়ান, মুআবিয়া, ইবন আমির, ইবন আবি সারহ এবং সাঈদ ইবনুল আস এর ইশারায় চলব না। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ অনুযায়ী খিলাফতের কার্যক্রম পরিচালনা করব। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবি সারহকে পদচ্যুত করলেন এবং তদস্থলে মিশরীয় প্রতিনিধি দলের মনঃপুত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রা.) কে মিশরের আমীর নিযুক্ত করলেন। হযরত আলী (রা.) এর মধ্যস্থতায় মিশরের প্রতিনিধি দল সন্তুষ্টচিত্তে ফের রওয়ানা হয়ে গেল। মিশরীয় কাফেলা তিন মনযিল অতিক্রম করার পর পথিমধ্যে উষ্ট্রারোহী এক হাবশী গোলামকে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করতে দেখল। তাদের মনে সন্দেহ জাগলে তারা গোলামকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করল। গোলামটি বলল, আমীরুল মুমিনীন তাকে মিশরের গভর্ণরের কাছে পাঠিয়েছেন। সে কার গোলাম জানতে চাইলে কখনো বলে আমীরুল মুমিনীনের, আবার কখনো বলে মারওয়ানের। তাকে তালাশ করে তার কাছে একখানা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিখানা আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে মিশরের শাসনকর্তার কাছে লিখা। এতে আমীরুল মুমিনীনের সীলমোহর দেওয়া। এতে লিখা রয়েছে- মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রা.) এবং তার সাথীদেরকে কতল করে ফেল। পত্র পাঠ করে মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রা.) ও তার সাথীগণ ক্ষেপে গেল এবং পুনরায় মদীনায় চলে আসল। হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সাদ এবং হযরত আলী (রা.) কে জমা করে পত্র দেখাল। উল্লেখিত সাহাবীগণ পত্র, গোলাম ও উষ্ট্রী নিয়ে হযরত উসমানের কাছে আসলেন। হযরত উসমান (রা.) শপথ করে পত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর পত্রের পরিচয় পাওয়া গেল। জানা গেল পত্রখানা মারওয়ানের লিখা। জনগণ হযরত উসমানের ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়ে গেল। তখন মিশরীয় কাফেলা দাবি জানালো মারওয়ানকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা হোক। খলীফা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। তখন তারা খলীফার পদত্যাগ দাবি করল। হযরত উসমান বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে যে পদে বহাল করেছেন প্রাণ থাকতে আমি নিজের পক্ষ থেকে এ পদ পরিত্যাগ করব না এবং রাসূল ﷺ এর ওসিয়ত মুতাবিক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবর করতে থাকব। বিদ্রোহী দলের একটি শর্ত মারওয়ানকে তাদের হাতে সোপর্দ করা, না হয় খলীফার পদত্যাগ। আমীরুল মুমিনীন উভয় শর্ত প্রত্যাখ্যান করলে বিদ্রোহীগণ খলীফার বাড়ি কঠোরভাবে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং খলীফাকে হত্যা করে। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪)

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের অন্যতম কারণ মারওয়ানের জাল চিঠি এবং বিদ্রোহীদের হাতে মারওয়ানকে সোপর্দ না করা। যদিও মারওয়ান কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন কিন্তু এর বিচার করার অধিকার মূলত খলীফার। তাই খলীফা তাকে বিদ্রোহীদের হাতে সোপর্দ করেননি। দ্বিতীয়ত মুসলিম জাহানের জনগণের আনুগত্যের মাধ্যমে নিযুক্ত খলীফা কতিপয় মানুষের মতামতে অপসারিত হতে পারেন না। তাই বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় দাবিও তিনি গ্রহণ করেননি।

মারওয়ান কর্তৃক হযরত তালহা (রা.) কে হত্যা

উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) হযরত আলী (রা.) এর বিপক্ষে ছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.) যুবাইর (রা.) কে ডেকে বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি মনে আছে, একদা আল্লাহর নবী তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি আলীকে ভালোবাসো কি না? তুমি উত্তরে বলেছিলে, হ্যাঁ, ভালোবাসি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন আল্লাহর নবী বলেছিলেন, কিন্তু তুমি একদিন অন্যায়ভাবে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যুবাইর বললেন, আমার স্মরণ হয়েছে। তারপর হযরত আম্মারকে হযরত আলীর পক্ষে দেখে তাঁর বিশ্বাস হলো তিনি ইজতিহাদী ভুল করেছেন। কারণ রাসূল ﷺ বলেছিলেন, আম্মারকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তখন যুবাইর (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। হযরত যুবাইরকে চলে যেতে দেখে তালহা (রা.)ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার উদ্যোগ নিলেন। এদিকে মারওয়ান টের পেয়ে গেলো যে, তালহা চলে যাচ্ছেন। তখন মারওয়ান হযরত তালহাকে তীর মেরে হত্যা করে ফেললেন। এভাবে জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী তালহা (রা.) শহীদ হয়ে গেলেন।

নামাযের আগে খুতবা দেওয়ার বিদআত জারী

মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দিতো। অথচ রাসূল ﷺ ও তাঁর পরবর্তী সময়ে ঈদের নামাযের পরে খুতবা দেওয়া হতো। এ সম্পর্কে একটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করা হলো-

عن أبي سعيد الخدري كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحى إلى المُصَلّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فيَقُومُ مُقابِلَ النّاسِ، والنّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ فيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ قالَ أبو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النّاسُ على ذلكَ حتّى خَرَجْتُ مع مَرْوانَ- وهو أمِيرُ المَدِينَةِ- في أضْحًى أوْ فِطْرٍ، فَلَمّا أتَيْنا المُصَلّى إذا مِنْبَرٌ بَناهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَإِذا مَرْوانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقُلْتُ له: غَيَّرْتُمْ واللهِ، فَقالَ أبا سَعِيدٍ: قَدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: ما أعْلَمُ واللهِ خَيْرٌ ممّا لا أعْلَمُ، فَقالَ: إنَّ النّاسَ لَمْ يَكونُوا يَجْلِسُونَ لَنا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَجَعَلْتُها قَبْلَ الصَّلاةِ.

-আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আদহার দিন ঈদগাহে যেতেন। এদিন সর্বপ্রথম যে কাজটি করতেন তা হলো (ঈদের) নামায পড়া। নামাযের পর জনগণের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। জনগণ নামাযের কাতারে বসে থাকতেন। রাসূল ﷺ তাদের নসীহত করতেন, ওসীয়ত করতেন এবং হুকুম দিতেন। যদি কোনো সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাদের প্রেরণ করতেন, যা হুকুম দেওয়ার দিতেন এবং ফিরে আসতেন। জনগণ সর্বদা এভাবে করতে থাকলেন। তারপর আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আদহার দিন বের হলাম। মারওয়ান তখন মদীনার গভর্ণর ছিল। আমরা ঈদগাহে পৌঁছে সেখানে মিম্বর দেখতে পেলাম, যা কাসীর বিন সালত তৈরি করেছেন। মারওয়ান নামায পড়ার আগেই মিম্বরে আরোহণ করার ইচ্ছা করল। আমি

তার কাপড় ধরে টান দিলাম। মারওয়ানও আমাকে টান দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে মিম্বরে আরোহণ করল এবং নামাযের আগেই খুতবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ! তুমি সুন্নাত বদলে ফেললে। তখন মারওয়ান বলল, হে আবূ সাঈদ! তুমি যা জানো তা চলে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তা আমার না জানা বিষয় থেকে উত্তম। মারওয়ান বলল, লোকজন নামাযের পর আমাদের কথা শুনার জন্য বসে থাকে না। এজন্য আমি খুতবাকে নামাযের আগে নিয়ে এসেছি। (বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, বাবুল খুরুজ ইলাল মুসাল্লা বিগাইরি মিনবারিন)

মারওয়ান নিজে স্বীকার করছেন যে জনগণ নামাযের পর তার খুতবা শুনতে চাইতেন না। কারণ ইতোপূর্বে তার অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন- ১. হযরত উসমান (রা.) এর নামে জাল পত্র লিখে হযরত উসমানের মোহর মেরে মিশরের গভর্নরের কাছে পাঠানো। মারওয়ানের এ ঐতিহাসিক জালিয়াতী হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাতের অন্যতম কারণ হয়েছিল। ২. হযরত তালহা (রা.) কে বিনা দোষে নিজ হস্তে তীর মেরে হত্যা। ৩. মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে জুমুআর দিন খুতবার সময় হযরত আলী (রা.) কে গালমন্দ করা ইত্যাদি। এসব কারণে মদীনাবাসী মারওয়ানের প্রতি সীমাহীন অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং মারওয়ানের খুতবা শুনতে চাইতেন না। মারওয়ানই সর্বপ্রথম ঈদের নামাযের আগে খুতবা দেওয়ার বিদআত জারী করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অনেক মনীষী মারওয়ানকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর 'ফাতওয়ায়ে আযীযী' এর মধ্যে রয়েছে-

جواب سوال خامس آنکہ مروان علیہ اللعنۃ را بد گفتن وبدل ازونیز اربودن خصوصا درسلوکے کہ با حضرت امام حسین واہلبیت مینمود ند وعداوت مستقرہ ازان بزر گواران دردل داشت از لوازم سنت ومحبت اہل بیت است کہ ازجملہ فرائض ایمان است

-আহলে বাইতের মুহাব্বাত ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে একটি। এটি সুন্নাত, প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। আর আহলে বাইতের মুহাব্বতের অন্তর্ভুক্ত হলো মারওয়ান আলাইহিল লা'নতকে মন্দ বলা এবং অন্তর থেকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। বিশেষত সে ইমাম হুসাইন ও আহলে বাইতের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে এবং তাদের সাথে পূর্ণাঙ্গ শত্রুতা পোষণ করেছে। এ দৃষ্টিতে তার প্রতি সর্বাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত। (ফাতওয়ায়ে আযীযী)

জানা আবশ্যক যে, মারওয়ান সাহাবী নয় এবং তাবিঈ হওয়ার জন্য যে শর্ত তাও মারওয়ানের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

মারওয়ান মৃত্যু পর্যন্ত বনূ হাশিমের শত্রু ছিল

আল্লামা ওয়াকিদী বর্ণনা করেন,

حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن أبي عتيق، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: شهدنا حسن بن علي يوم مات، فكادت الفتنة تقع بين حسين بن علي ومروان بن الحكم، وكان الحسن قد عهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خاف أن يكون في ذلك قتال فليدفن بالبقيع، فأبى مروان أن يدعه، ومروان يومئذ معزول يريد أن يرضي معاوية بذلك، فلم يزل مروان عدوا لبني هاشم حتى مات.

-ইবরাহীম বিন ফযল আবূ আতিক থেকে আমাদের বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদিল্লাহকে বলতে শুনেছি, হাসান বিন আলী যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমরা উপস্থিত ছিলাম। সেদিন হুসাইন বিন আলী (রা.) এবং মারওয়ানের মাঝে ফিতনার আশঙ্কা দেখা দিল। হযরত হাসান (রা.) তাঁর ভাই হুসাইন (রা.) কে বলেছিলেন তাঁকে (হাসানকে) যেন রাসূল ﷺ এর কাছে দাফন করেন। তবে যদি কোনো যুদ্ধ বা অমঙ্গল এর আশঙ্কা দেখা দেয় তবে তাঁকে (হাসানকে) জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যেন দাফন করা হয়। তখন মারওয়ান বাধা সৃষ্টি করল। এ সময়ে মারওয়ান পদচ্যুত ছিল এবং মুআবিয়াকে এ কাজের মাধ্যমে খুশি করার জন্য সচেষ্ট ছিল। মারওয়ান মৃত্যু পর্যন্ত বনূ হাশিমের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮)

মারওয়ান মসজিদে নববীর মিম্বরে হযরত আলীকে গালি-গালাজ করে বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করত। কারণ মৃত্যু পর্যন্ত মারওয়ান বনূ হাশিম তথা আহলে বাইতের প্রতি সীমাহীন শত্রুতা পোষণ করত। হযরত আলী (রা.) যদিও ইতোপূর্বে জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন এবং এ মসজিদে তিনি উপস্থিত নন; তথাপি হযরত আলী (রা.) এর পুত্রগণ ও বনূ হাশিমের অন্যান্য অনেকে যেহেতু এ মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করতেন সেহেতু এ সকল মানুষের মনে আঘাত করার সুযোগ মারওয়ান কেন ছাড়বে? *(চলবে)*

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম তাসনীম
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

কাসীদায়ে বুরদা ও নবী প্রেমের উপহার

মাওলানা মোহাম্মদ ছরওয়ারে জাহান

নবী প্রেমে কাসীদা বা কবিতা লিখে যে ক'জন বিশ্বব্যাপী অমর হয়ে রয়েছেন, তার মধ্যে ইমাম বুসীরী (র.) অন্যতম। কাসীদায়ে বুরদা লিখে তিনি স্বখ্যাতিতে অমর হয়ে আছেন। তাঁর প্রকৃত নাম শাইখ আবূ আব্দিল্লাহ্ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (র.)। ৬০৮ হিজরীর ১ শাওয়াল তথা ঈদের দিন তিনি মিশরের বুসির নামক জনপদে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা দালাস জনপদের বাসিন্দা ছিলেন। এ জন্য কেউ কেউ তাঁকে আদ-দালাসিরী নামেও আখ্যায়িত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে কাসীদায়ে বুরদা সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা। এছাড়াও তাঁর অন্যতম কবিতা হচ্ছে 'আল-কাসিদাতুল হামযিয়্যাহ' ও 'যুখরুল মাআদ ফী মুআরদাতি বানাত সুআদ'। ইমাম বুসীরী ছিলেন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত সাহিত্যিক ও একজন অনুকরণীয় কবি। তিনি একজন আশিকে রাসূল ও বুযুর্গ হিসেবেও দুনিয়ায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কালজয়ী কবিতা 'কাসীদায়ে বুরদা' এর আসল আরবী নাম হলো الكوكب الدرية في مدح خير البرية

১৬৫ লাইনের সুবিখ্যাত ও সুদীর্ঘ কবিতাটিকে তিনি দশটি ভাগে বিভক্ত করেন

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা।
২. প্রকৃতি ও তার চাহিদা।
৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসা।
৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওয়ালাদাত শরীফ।
৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুজিযা ও দ্বীনের দাওয়াত।
৬. কুরআন শরীফের মর্যাদা।
৭. পবিত্র মিরাজের বর্ণনা।
৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমরাভিযান।
৯. আল্লাহর মাগফিরাত কামনা।
১০.মুনাজাত।

কাসীদায়ে বুরদার নামকরণ ও রচনার মূলপ্রেরণা:

আগেই বলা হয়েছে কাসীদার মূল নাম 'আলকাওকাবুদ দুররিয়্যাহ ফী মাদহি খাইরিল বারিয়্যাহ'। এছাড়া কাসীদাটির আরো দুটি নাম রয়েছে। এর একটি হলো 'বুরাআস' অর্থাৎ আরোগ্য । যেহেতু কবি এই কবিতার বরকতে আরোগ্য লাভ করেছিলেন তাই এই নামকরণ। তবে এই কাসীদার সর্বাধিক পরিচিত নাম কাসীদায়ে বুরদা। এই নামের তাৎপর্য হলো যে, কবির স্বপ্নের মধ্যে এই কাসীদা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশি হয়ে নিজের নকশী চাদরটি কবির গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই এই কবিতাকে 'বুরদা' বলা হয়। আর এই নামেই কাসিদাটি বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। কবি এক সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় আবদ্ধ হয়ে যান। কোন চিকিৎসায়ই তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। রোগ মুক্তির প্রার্থনার নিয়ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় একটি কবিতা লিখেন এবং এর ওয়াসীলায় আরোগ্য প্রার্থনা করেন। কাসীদা লেখা সমাপ্ত হলে একদিন জুমুআ বার রাতে উক্ত কাসীদাটি আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখেন তার ঘর নূরে আলোকিত হয়ে গেছে। সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে, তাশরীফ এনেছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, সঙ্গে দুই সঙ্গী। নবীজির নির্দেশে তিনি কাসিদাটি আবৃত্তি শুরু করেন। যখন তিনি فمبلغ العلم أنه بشر পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন লাইনের শেষাংশ তিনি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলেন না। বেশ কয়েকবার আওড়ানোর পর আল্লাহর রাসূল নিজেই বলে দিলেন وأنه خير خلق الله كلهم আবার আবৃত্তি আরম্ভ করলেন ৮৭ নম্বর পংক্তি যখন বললেন,

كم أبرأت وصبا باللمس راحته
وأطلقت أربا من ربقة اللمم

অর্থাৎ, স্পর্শ দ্বারা পবিত্র হাত কত পীড়িতকে সুস্থ করেছিলেন এবং কত অভাগাকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন তখন প্রিয়নবী ﷺ মুবারক হাত দিয়ে কবির সমস্ত দেহ মাসেহ করে দেন। কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে নবীজি নিজের গায়ের চাদরখানা কবির গায়ে জড়িয়ে দেন। ঘুম থেকে জেগে নবীজিকে আর দেখতে পেলেন না। কিন্ত তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং বরকতময় সেই চাদর খানা তাঁর গায়ে জড়ানো রয়েছে। তিনি সকালে ঘর থেকে বের হলে অন্যতম দরবেশ স্বীয় বন্ধু শাইখ আবু রাজার সঙ্গে বাজারের রাস্তায় তার দেখা হয়। তিনি কবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,'আপনার লেখা কাসীদাটি আমাকে শুনান তো-যেটি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় লিখেছেন'। কাসীদায়ে বুরদার কথা কবি ইতোপূর্বে কাউকে জানাননি। তিনি বললেন আপনি কোন কবিতার কথা বলছেন? আমি তো অনেক কবিতাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে লিখেছি।

দরবেশ বললেন সেটির প্রথম লাইন হলো-

أمن تذكر جيران بذي سلم
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

কবি বললেন, আবু রাজা! আপনি কোথা থেকে এই লাইন মুখস্ত করলেন? আমিতো কাউকে এটা পড়ে শুনাইনি। আবু রাজা বললেন, আপনি গত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কবিতাটি শুনাচ্ছিলেন তখন আমিও সেখানে ছিলাম। আমি পাশে থেকে শুনছিলাম।

কাসীদার মর্যাদা: কাসীদায়ে বুরদা একটি মহা বরকতময় কবিতা হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। বিশেষ নিয়মে এই কাসীদা পাঠ করলে রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়।

অনেকে এই কাসীদার বরকতে কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। কাসীদা পাঠের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পদ্ধতি হলো-

১. উযূ করা
২. কিবলাহমুখী হয়ে পড়া
৩. শব্দসমূহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা
৪. অর্থ বুঝে পাঠ করা
৫. ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে পাঠ করা
৬. মুখস্থ পাঠ করা
৭. পাঠককে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ইযাযত নেওয়া
৮. নবীজির উপর কবি মনোনীত নির্দিষ্ট দুরূদ তথা

مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

পাঠ করা।

ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, তুর্কি, ফার্সি ও বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় এই কাসীদার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাসীদার ভাষ্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশত । নবী প্রেমিক ইমাম বুসীরী (র.) ৬৯৬ হিজরী সনে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন।

তথ্যসূত্র:

- জুরযী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা
- হান্না আল-ফাখুরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী

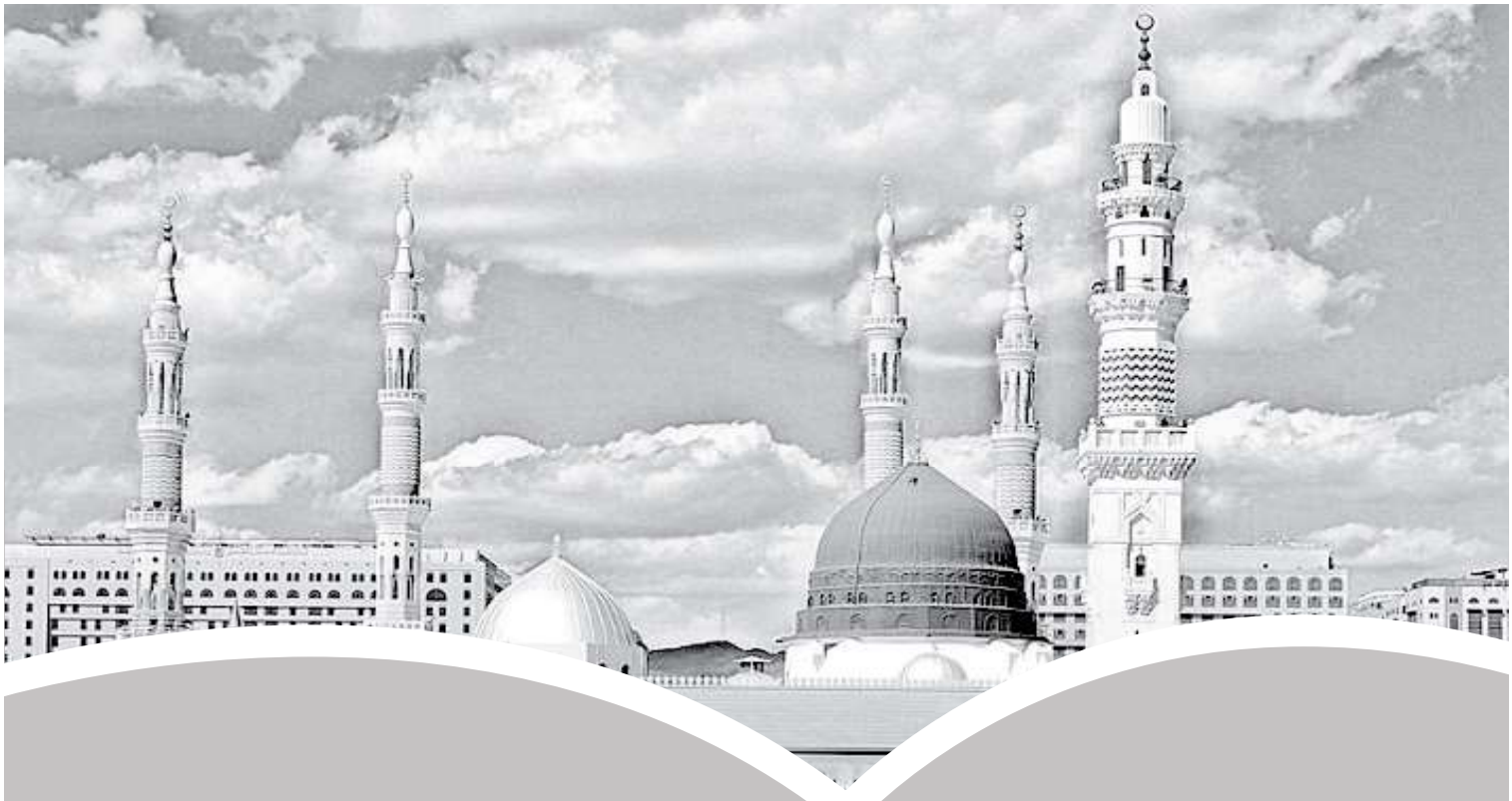

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : আরোপিত অপবাদ ও অমুসলিম পণ্ডিতদের মূল্যায়ন

মারজান আহমদ চৌধুরী

খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল এইচ. হার্ট ১৯৭৮ সালে The 100: A Ranking of the Most Influential Persons In History নামে একটি বই লিখেছিলেন। উক্ত বইয়ে লেখক এমন একশজন ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করেছেন, যারা মানব ইতিহাসে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। এরপর লেখক ওই একশজনের মধ্যে ক্রমবিন্যাস করেছেন এবং সবার ওপরে যে মহান ব্যক্তিত্বকে স্থান দিয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন আসে, একজন আমেরিকান খ্রিস্টান বিজ্ঞানী ইসলামের নবীকে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দিলেন কেন? জবাবটি দিয়েছেন লেখক নিজে। বলেছেন, "বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষস্থানে আমি মুহাম্মাদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে নিয়েছি, এ ব্যাপারটি অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগতে পারে। প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি একইসাথে ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছেন।" (The 100, New York, 1978, p. 33)

এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও আমরা দেখেছি। পশ্চিমা বিশ্বে যুগের পর যুগ আমাদের নবীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনো সত্যকে ভেঙ্গেচুরে, কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নির্বোধ পাদ্রীরা বদনাম ছড়িয়েছে। সালমান রুশদীর মতো পশ্চিমাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা এসব কুৎসা ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। বিষয়টি স্বীকার করেছেন গত শতাব্দীর খ্যাতিমান পণ্ডিত, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম মন্টগোমরি ওয়াট। তিনি বলেছেন, 'মানব ইতিহাসের আর কোনো মহান ব্যক্তিকে পশ্চিমা বিশ্বে এতো বাজেভাবে উপস্থাপন করা হয়নি, যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মুহাম্মাদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' (Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p. 52)

আমরা দেখব, নিন্দুকদের পক্ষ থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আরোপিত অপবাদের যৌক্তিক বা ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি আছে কিনা। আমরা সেসব অমুসলিম পণ্ডিতদের মতামতকেও গ্রহণ করব, যারা নিরপেক্ষভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকে অধ্যয়ন করেছেন। নবী হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তি হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন– তা-ই এ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পশ্চিমাদের একটি বড় অংশ আমাদের নবীকে 'ছদ্মবেশী প্রতারক' বলে আখ্যায়িত করে। অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের দিকে তাকালে এ দাবির অসারতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি মানুষ নিজের জন্য একটি নির্বিঘ্ন শান্তিময় জীবন প্রত্যাশা করে। প্রথম ৪০ বছর আমাদের নবীর জীবনটিও ছিল নির্ঝঞ্ঝাট। বাল্যকাল

দারিদ্রের মধ্যে পার করলেও চাচা-চাচীর স্নেহের কমতি ছিল না। বিয়ের পর ঘরে সমৃদ্ধি ফিরেছিল। স্বচ্ছলতা,সম্মান, সংসার সবই পেয়েছিলেন তিনি। মক্কাবাসী তাঁকে সততার প্রতিকস্বরূপ আল-আমীন বলে ডাকত, তাঁর রায়কে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিত। কিন্তু যেইমাত্র তিনি ঈমানের দাওয়াত শুরু করলেন, রাতারাতি সবকিছু পাল্টে গেল। আপনজনরা শত্রু হয়ে গেল। শুরু হলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালিগালাজ, অপবাদ, অবমাননা, নির্যাতন। এমনকি তাঁর শিশুপুত্রের মৃত্যুতে উল্লসিত হয়েছিল তাঁর নিজের গোত্রের লোকজন। গলায় চাদর পেছিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সেজদারত অবস্থায় পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে উটের পঁচা নাড়িভুঁড়ি। পরিবারসমেত তিন-তিনটি বছর তাঁকে পাহাড়ি উপত্যকায় নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। চাচা ও স্ত্রী হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে তায়েফ গিয়েছিলেন আমাদের নবী। পাষাণহৃদয় তায়েফবাসী তাঁর ওপর বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করেছে। হিজরতের রাতে তাঁকে হত্যা করবে বলে মক্কার যুবকরা ঘরের পাশে জড়ো হয়েছিল। হিজরতের সময় তাঁর চোখ বেয়ে পড়েছে বেদনার অশ্রু। মদীনায় যাওয়ার পরও বারবার তাঁকে মক্কাবাসীর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায়ও উমরাহ করতে দেওয়া হয়নি। হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহ এসব ঘটনায় ভরপুর। কোনো প্রতারক, যার নিজের দাবির ওপরই বিশ্বাস নেই, তার পক্ষে কি জীবনভর এরকম নিপীড়নের মুখে অটল থাকা সম্ভব? দ্বীন ত্যাগ করার বিনিময়ে মক্কাবাসী আমাদের নবীকে যেসব লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল, যে কোনো ছদ্মবেশী প্রতারক তাতে মোমের মতো গলে যেত। কিন্তু তিনি একটিবারের জন্যও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। অন্য কেউ তাঁর দাবি বিশ্বাস করুক বা না করুক, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর একত্ববাদ এবং নিজের রিসালাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মন্টগোমরি ওয়াট স্বীকার করেছেন, "নিজের আদর্শের জন্য নিপীড়ন সহ্য করা, তাঁর সঙ্গীদের উত্তম চরিত্র এবং তাঁর চূড়ান্ত সাফল্য– সবকিছু এক বাক্যে তাঁর মৌলিক সততার সাক্ষ্য দিচ্ছে" (Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p. 52)। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আনফান্সো দ্য লেমার্টিন বলেছেন, "সুমহান আদর্শ,সামান্য সরঞ্জাম এবং দীপ্তিমান সাফল্য— যদি এ তিনটির দ্বারা মানুষের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, তাহলে কার সাহস আছে মুহাম্মাদের সাথে অন্য কাউকে তুলনা করার?" (Histoire De La Turquie, Paris, 1854, vol. II, p. 276-277)

ইসলাম-বিদ্বেষীরা আমাদের নবী ﷺ এর প্রতি তিনটি পদ্ধতিতে অপবাদ আরোপ করে। হয় তারা প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাদ দিয়ে কুরআন বা হাদীসের খণ্ডিত অংশ উপস্থাপন করে, নতুবা সত্যকে ভেঙ্গেচুরে উপস্থিত করে, নতুবা ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয় । প্রথম পদ্ধতির ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের খণ্ডাংশ হচ্ছে, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ -মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, হত্যা করবে। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-০৫)

এ আয়াতের প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে কেবল খণ্ডিত অংশ তুলে ধরলে মানুষ শিউরে উঠবে। অথচ আয়াতটি এখানে শেষও হয়নি, এখান থেকে শুরুও হয়নি। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে।

৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হুদাইবিয়ার সন্ধিতে বলা হয়েছিল, কুরাইশ ও মুসলমান এবং উভয়ের মিত্ররা পরবর্তী ১০ বছর একে অন্যের ওপর আক্রমণ করবে না। কিন্তু এক বছরের মাথায় কুরাইশদের মিত্র বনু বকর মুসলমানদের মিত্র বনু খোযায়ার ওপর আক্রমণ করে। এর ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধি অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং ৮ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় করেন। ৯ম হিজরীতে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে কৃত পূর্বেকার যাবতীয় চুক্তি বাতিল করে দেন (সূরা তাওবাহ, আয়াত-০১)। এরপর মক্কাবাসী মুশরিক, যারা এত বছর ধরে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছিল এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল, তাদেরকে চার মাস সময় দেওয়া হয়। বলা হয়, ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা চার মাস পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এর পেছনে কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণ ছিল চুক্তিভঙ্গের শাস্তি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে,আল্লাহ যখন কোনো জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেন এবং সেই জাতি রাসূলকে অস্বীকার করে,তখন আল্লাহ ওই জাতিকে ধ্বংস করে দেন (সূরা তাওবাহ, আয়াত-৭০)। পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্প্রদায়কে আল্লাহ একই কারণে আসমানী আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। মক্কাবাসী মুশরিকরা যেহেতু রাসূল ﷺ কে অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তাই তাদের প্রতিও এরকম আযাব আসার কথা ছিল। তবে সেই আসমানী আযাব আসেনি। কারণ আইন হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে আল্লাহর আযাব আসে না (সূরা আনফাল, আয়াত-৩৩)। তাই মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিয়ে দিয়েছেন (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১৪)। এটি মূলত ওই আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত। এবার যদি উল্লেখিত আয়াতের দিকে ফিরে যাই, তাহলে বুঝতে পারব যে, উক্ত আয়াতটি কেবল সেই সময়কার মক্কাবাসী মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। এখানে পৃথিবীর সব অমুসলিমকে হত্যা করার কথা বলা হয়নি। মুসলিম বিশ্বে অগণিত সংখ্যক মুর্তিপূজারী সব যুগেই ছিল এবং আজও আছে। এই সব প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে দীর্ঘ একটি সূরা থেকে একটি আয়াতের খণ্ডাংশ তুলে আনলে পুরো বিষয়টি কিভাবে বোধগম্য হবে?

একই ব্যাপার ঘটে হাদীসের ক্ষেত্রেও। সহীহ বুখারীতে আনাস (রা.) এর সূত্রে একটি হাদীস এসেছে। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মদীনায় তারা অসুস্থ বোধ করায় রাসূল ﷺ তাদেরকে 'যুল জাদর' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানে সাদকার উট চরানো হতো। তারা সেখানে গিয়ে উটের দুধ এবং মুত্র (চিকিৎসাস্বরূপ)পান করে আরোগ্য লাভ করল। এরপর ইসলাম ত্যাগ করে উটের পাল নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসূল ﷺ তাদেরকে গ্রেফতার করে আনালেন এবং তাদের হাত পা কেটে, চোখ উপড়ে মৃত্যুর জন্য ফেলে রাখা হলো। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, 'হত্যার বিনিময়ে হত্যা' ঠিক আছে। কিন্তু এমন নির্মমতা কেন? এর কারণ হলো, তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় উটের রাখালদেরকে ঠিক এভাবেই হত্যা করেছিল (তাবাকাত ইবন সাদ, খ. ২, পৃ. ১১৪)। তাই তাদেরকেও সমভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আনাস (রা.) যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তখন পুরো ঘটনা বলেননি। কারণ তখন সবাই মূল ঘটনাটি জানত। পরবর্তীতে ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে কেবল হাদীসের অংশকে সামনে এনে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। এই হচ্ছে ইসলাম-বিদ্বেষীদের প্রথম অস্ত্র।

ইসলাম-বিদ্বেষীদের দ্বিতীয় অস্ত্র হচ্ছে সত্যকে ভেঙ্গেচুরে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন একদম মিথ্যেও না হয়, আবার উদ্দেশ্যও সাধন হয়ে যায়। বুঝানোর জন্য

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক মহিলা রাসূল ﷺ কে বললেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে নামায-রোযা করতে বাধা দেন এবং নিজেও ফজরের নামায পড়েন না। রাসূল ﷺ ওই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার স্ত্রী প্রতিদিন নফল রোযা রাখেন। সারা রাত নামায পড়েন। আমি যখনই তাঁকে কাছে পেতে চাই, হয় তিনি নামাযে, নয়তো রোযাদার। আর আমরা বংশগতভাবে গাঢ় ঘুমে অভ্যস্ত। আমি চেষ্টা করি ফজরের সময় জাগ্রত হতে, কিন্তু পারি না।" এবার বিষয়টি পরিষ্কার হলো। এখানে ওই মহিলা মিথ্যা বলেননি। কিন্তু তিনি পুরো সত্য না বলে আংশিক বলেছেন, তাই বিষয়টি পাল্টে গেছে। একইভাবে ইসলাম-বিদ্বেষীরা অর্ধ বা ভাঙ্গাসত্যের সাহায্যে আমাদের নবী ﷺ এর ব্যক্তিজীবনে আঘাত করে। যেমন আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) যখন রাসূল ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন আয়িশা (রা.) এর বয়স ছিল ৯ এবং আমাদের নবীর বয়স ছিল ৫৩ বছর। এ জন্য ইসলাম-বিদ্বেষীরা আমাদের নবীর ব্যাপারে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করে। অথচ তৎকালীন আরবসহ পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতায় এ ধরণের বিয়ে প্রচলিত ছিল,যেখানে স্বামী স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যেত। তাই মক্কার মুশরিক ও মদীনার ইয়াহুদীরা রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে বহু আজেবাজে কথা ছড়ালেও তাঁকে 'শিশু নিপীড়ক' কখনও বলেনি, যেটি আজকের যুগের ইসলাম-বিদ্বেষীরা বলে থাকে। অথচ তাদের দেখা উচিৎ ছিল যে, আমাদের নবী ﷺ এর ১ম স্ত্রী খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ থেকে ১৫ বছরের বড়। বয়স এখানে খুব গৌণ বিষয়।

ইসলাম-বিদ্বেষীরা আয়িশা (রা.) এর বাল্যবিবাহ নিয়েও প্রশ্ন তুলে। অথচ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটকে জুলিয়েটের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর বয়স যখন ১১ বছর, তখন থেকেই সবাই বলাবলি শুরু করল, বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও এ দুটিই কাল্পনিক চরিত্র, তবু একটি সময় ও সমাজের চিত্র বুঝার জন্য যথেষ্ট। মাত্র একশ বছর আগে যদি একটি মেয়ের বিয়ের বয়স ১১ হতে পারে, তাহলে সাড়ে ১৪শ বছর আগে ৯ বছরের মেয়ের বিয়ে কি খুব অস্বাভাবিক? যার বয়স নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের এত মাথাব্যাথা, সেই আয়িশা (রা.) কিন্তু কোনোদিন তাঁর বয়স নিয়ে অস্বস্তি বা উষ্মা প্রকাশ করেননি। আয়িশা (রা.) খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন। কিছু বলতে চাইলে তিনি মুখফোটে বলে দিতেন। তিনি যদি তাঁর বিয়ে বা বয়স নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে এর উল্লেখ কোথাও না কোথাও থাকত। কিন্তু অমুসলিমদের লিখিত গ্রন্থেও এরকম কিছু পাওয়া যায় না। বরং আয়িশা (রা.) রাসূল ﷺ কে এতটাই আপন ভাবতেন যে,তিনি রাসূল ﷺ এর অন্য স্ত্রীদের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করতেন। এরকম অসংখ্য হাদীস আমাদের সংগ্রহে রয়েছে। ইসলাম-বিদ্বেষীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একাধিক বিবাহ নিয়েও প্রশ্ন তুলে। অথচ আরব সংস্কৃতিতে তখন এবং এখনও বহুবিবাহ একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের নবী ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়িশা (রা.) ব্যতীত আর কেউ কুমারী ছিলেন না। সবারই আগে এক বা একাধিক বিয়ে হয়েছিল এবং কয়েকজনের সন্তানাদিও ছিল। আমাদের নবী ﷺ স্বামীহারা এসব নারীকে নিজের ঘরে তুলে এনেছিলেন, উম্মাহাতুল মুমিনীনের মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁদের সন্তানদেরকে নিজের সন্তানের মতো লালনপালন করেছিলেন।

আমাদের নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে ইসলাম-বিদ্বেষীদের শেষ অস্ত্র হচ্ছে ডাহা মিথ্যাচার। এক্ষেত্রে আরবের মূর্খ আবু জাহল যেমন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও তেমন। যুগ পরিবর্তন হয়েছে, শিক্ষাদীক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মিথ্যা মিথ্যাই রয়ে গেছে। অবশ্য তৎকালীন বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের নবীর প্রতি যেসব অপবাদ আরোপ করেছিল, স্বয়ং আল্লাহ এসব অপবাদের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। মুশরিকরা বলেছে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজে কবিতা রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেন। আল্লাহ জবাব দিয়ে বলেছেন, (কুরআন) কোনো কবির কবিতা নয় (সূরা হাক্কাহ, আয়াত-৪১)। মুশরিকরা বলেছে, তিনি একজন গণক, জিনের সাহায্যে ভবিষ্যত গণনা করেন। আল্লাহ জবাব দিয়ে বলেছেন, "এটি কোনো গণকের কথা নয়" (সূরা হাক্কাহ, আয়াত-৪২)। মুশরিকরা বলেছে, তিনি পাগল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন।" (সূরা কালাম, আয়াত-০২)

মধ্যযুগের পাদ্রীরা আমাদের নবী ﷺ এর ব্যাপারে কিছু মিথ্যা চালু করেছিল। বেশিরভাগই তারা মুখে মুখে ছড়িয়ে দিত। তারা আমাদের নবীর ব্যাপারে বলত, তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তারা বলত, মুসলমানরা তাদের নবীর ইবাদত করে। বলাই বাহুল্য, এসব নির্জলা মিথ্যা বেশিদিন টিকতে পারেনি। তারা দাবি করত, আমাদের নবী ﷺ ৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেছেন। যদিও সবাই জানে যে, রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেছেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। এ মিথ্যাচারের কারণ হচ্ছে, খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী ৬৬৬ (Triple Six) দাজ্জালের চিহ্ন। এখান থেকেই বুঝা যায় তাদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল। তবে এসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে তারা ইসলামের সয়লাবকে রুখতে পারেনি। বরং যুগে যুগে পশ্চিমা পণ্ডিতরাই এসব মিথ্যাচার খণ্ডন করেছেন। সর্বকালের সেরা ঔপন্যাসিক লিও তলস্তয় বলেছেন, "মুহাম্মাদ ﷺ খোদাকে মানুষ বলেননি, আবার নিজেকেও খোদার সমতুল্য ভাবেননি। মুসলিমরা খোদা ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে না এবং মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন খোদার পয়গাম্বর। এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, কোনো লুকোচুরি নেই" (Treatise on Sayings of Muhammad, by Lev Nikolayevich Tolstoy)। ব্রিটিশ গবেষক আর. বি. স্মিথ আমাদের নবীর ব্যাপারে বলেছেন, "তিনি ছিলেন ধর্মগুরু এবং সম্রাট। তবে তাঁর মধ্যে (খ্রিস্টান) পাদ্রীদের মতো ভণ্ডামি ছিল না। আবার রোমান সম্রাটের মতো বিশাল সেনাবাহিনীও ছিল না। না দেহরক্ষী, না প্রাসাদ, না বেতন। যদি পৃথিবীতে একজন মানুষ এই দাবি করার যোগ্য হন যে, তিনি খোদায়ী শক্তিতে দুনিয়া শাসন করেছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ।" (Mohammed and Mohammedanism, London, 1874, p. 235)

আমাদের নবী ﷺ মানব ইতিহাসের একমাত্র সংস্কারক, যিনি মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মার্কিন দার্শনিক জন উইলিয়াম ড্রেপার এ প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এক ইয়াতিম শিশু। সেই ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদ মানব সভ্যতাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন।" (A History of the Intellectual Development of Europe, London, 1875, vol. 1, p. 329-330)। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেভিড জর্জ হোগার্থ যথার্থ বলেছেন, "গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ, তাঁর প্রতিটি দৈনন্দিন আচরণ (মুসলিমদের জন্য) অনুশাসন, যা আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ সচেতনভাবে অনুকরণ করে যাচ্ছে। গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য কোনো ধর্মপ্রবর্তক ওই সম্মানের জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি, যেখানে পৌঁছেছেন

মুসলমানদের নবী" (Arabia, Oxford, 1922, p. 52)। যারা আমাদের নবী ﷺ এর প্রতি ভণ্ডামি বা প্রতারণার অপবাদ আরোপ করে, তারা কখনও আমাদের নবীর জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেনি। ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি (১৯১৭) অ্যানি বেসেন্ট লিখেছেন, "যতবার আমি রাসূলের জীবন অধ্যয়ন করি, ততবার আরবের সেই মহান শিক্ষকের প্রতি নতুন শ্রদ্ধাবোধ,নতুন ভক্তি জন্ম নেয়।" (The Life And Teachings Of Muhammad, Madras, 1932, p. 4)

রাসূল ﷺ এর সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দাসপ্রথা সংস্কার। অনেকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত দাসপ্রথা নিয়ে অভিযোগ করে। অথচ ইসলাম দাসপ্রথার প্রবর্তক নয়। বরং ইসলাম তো মানুষে-মানুষে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নিয়ে আগমন করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং ভাগ করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানি সে, যে অধিক তাকওয়াবান" (সূরা হুজুরাত, আয়াত- ১৩)। আমাদের নবী ﷺ পৃথিবীতে আসার বহু আগে থেকে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, পরেও ছিল। বরং রাসূল ﷺ ছিলেন দাসপ্রথা উৎখাত অভিযানের সূচনাকারী। এটি ঠিক যে, তিনি যেভাবে নাম ধরে মদ, জুয়া, সুদ নিষিদ্ধ করেছিলেন, দাসপ্রথাকে সেভাবে নিষিদ্ধ করেননি। কারণ তৎকালীন বিশ্ব বাস্তবতায় সেটি সহজ ছিল না। কিন্তু শেষের শুরু তিনিই করে দিয়েছেন।

সে সময় মানুষকে দাস বানানোর কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথমত, ক্রীতদাসের সন্তানরা দাস হিসেবে গণ্য হত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল, দরিদ্র কিংবা ঋণ পরিশোধে অপারগ, তাদেরকে অপহরণ করে জোরপূর্বক দাস বানানো হত। তৃতীয়ত, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসরূপে গ্রহণ করা হত। ২য় পদ্ধতিটি রাসূল ﷺ এক বাক্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, "তিন শ্রেণির মানুষের নামায কবুল হয়না। তন্মধ্যে একশ্রেণী হলো, যারা স্বাধীন মানুষকে দাস বানায়"। (সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবন মাজাহ)

১ম শ্রেণি, অর্থাৎ ক্রীতদাসের সন্তানদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ছিল,যদি কোনো ক্রীতদাসী তার মালিকের সন্তান জন্ম দেয়,তবে সে সন্তান ক্রীতদাস বলে গণ্য হবে না। বরং মালিকের স্বাধীন সন্তান বলে গণ্য হবে। এবং ওই সন্তানের কারণে তার জন্মদাত্রী মা দাসী থেকে উন্নিত হয়ে 'উম্মুল ওয়ালাদ' নামক একটি বিশেষ শ্রেণিতে চলে আসবেন। এর পেছনে হিকমাত হচ্ছে, যদি হঠাৎ করে সব ক্রীতদাসকে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আরবের কট্টর কৌলীন্যপ্রথায় বিশ্বাসী লোকেরা সহজে তা মেনে নেবে না। তাই এমন একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যাতে ক্রীতদাসীরা মালিকের ঘরে উম্মুল ওয়ালাদের মর্যাদা পায় এবং তাদের সন্তানরা স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে। এর ফলে ধীরে ধীরে তারা সমাজের মূলধারার সাথে মিশে যাবে। ৩য় শ্রেণি, অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যে দল বা জাতির মধ্যে যুদ্ধবন্দীকে দাস বানানোর প্রথা প্রচলিত ছিল,কেবল তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানো হত। আর যারা নিজেরা এ প্রথা অনুসরণ করেনা, তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানো হত না। এজন্য বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধ বা মক্কা বিজয়ের পর কোনো যুদ্ধবন্দীকে দাস বানানো হয়নি। কারণ এসব যুদ্ধ ছিল কুরাইশদের বিপক্ষে। আর কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধবন্দীকে দাস বানানোর প্রথা ছিল না। অপরদিকে মুরাইসি, খাইবার ও হুনাইনের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানো হয়েছিল। কারণ ওই যুদ্ধগুলো হয়েছিল যথাক্রমে মুস্তালিক, ইয়াহুদী এবং হাওয়াযিন গোত্রের সাথে। এদের মধ্যে যুদ্ধবন্দীকে দাস বানানোর প্রথা প্রচলিত ছিল।

ক্রীতদাসদেরকে স্বাধীন মানুষের কাতারে নিয়ে আসতে ইসলাম অনবরত প্রণোদনা দিয়েছে। হাদীসে এসেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। ক্রীতদাসকে যথেচ্ছা খাটানো, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কিংবা প্রহার করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ক্রীতদাসকে প্রহার করার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া (সুনান আবি দাউদ)। রাসূল ﷺ এবং সাহাবীরা জীবনভর কত শত ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন, তার হিসাব করা দুষ্কর। দাসমুক্তির পথ প্রশমিত করার জন্য ইসলামের সেরা পদ্ধতি ছিল কাফফারা। কসম ভঙ্গ করা, যিহার করা, রোযা ভঙ্গ করা, ভুলবশত হত্যা করা— এসব অপরাধের প্রথম কাফফারা হচ্ছে দাসমুক্তি। ইসলামে মুক্ত হওয়া ক্রীতদাস এবং তাদের সন্তানদের অবদান ক্ষেত্রবিশেষে মালিকের চেয়ে বহুগুণ উজ্জ্বলতর। তাবিয়ীদের যুগে বেশিরভাগ খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, ফুকাহা ও সেনাপতিরা ছিলেন মুক্ত হওয়া ক্রীতদাস বা দাসের সন্তান। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' The Genuine Islam লেখনিতে উল্লেখ করেছেন, "পশ্চিমাদের কাছে মুহাম্মাদ হচ্ছেন অপশক্তি। আমার মতামত হচ্ছে, তাঁকে অপশক্তি বলা তো দূরের কথা, বরং তাঁকে বলা উচিৎ বিশ্বমানবতার রক্ষাকারী। তাঁর মতো একজনকে যদি আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়ে দেওয়া হত, তাহলে তিনি সব সমস্যাকে এমনভাবে সমাধান করতেন যে, এই বিশ্ব কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ অর্জন করতে পারত।"

যুগে যুগে হিংসুকরা আমাদের নবীকে নিয়ে কুৎসা রটনা করেছে। তবে সূর্যকে কখনও ঢেকে রাখা যায় না। ইউরোপে থমাস কার্লাইল এবং আমেরিকায় ওয়াশিংটন আর্ভিং— এ দুই দার্শনিক প্রথমবার নিরপেক্ষভাবে আমাদের নবীকে মূল্যায়ন করা শুরু করেছিলেন। ফলে পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের নবীর প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত হয়েছিল। সেই পথ ধরে আজকের যুগে লিখে যাচ্ছেন বরেণ্য লেখিকা কেরন আর্মস্ট্রং, যার কলমে ঝরে পড়েছে আমাদের নবী ﷺ এর প্রশংসাস্তুতি। যে ভারতের মাটিতে সালমান রুশদীর মতো মিথ্যুকের জন্ম হয়েছিল,সেই ভারতের স্বাধীনতার মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী এবং সরোজিনী নাইডু আমাদের নবীকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন।

এ নিবন্ধে আমরা রাসূল ﷺ এর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার ব্যাপারে কোনো কথা বলিনি। কেবল তাঁর মানবিক বৈশিষ্ট্য, আরোপিত অপবাদের পর্যালোচনা এবং অমুসলিমদের মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলেছি। তাই নিবন্ধ শেষ করছি মহিশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কে. এস. রামাকৃষ্ণ রাও (মার্চ,১৯৭৮) এর উক্তি দিয়ে। তিনি বলেছেন, "কী এক মনোমোহকর জীবন ছিল তাঁর, তিনি ছিলেন একজন পয়গাম্বর, সেনাপতি, সম্রাট, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বক্তা, সমাজ সংস্কারক, ইয়াতিমের আশ্রয়স্থল, ক্রীতদাসের রক্ষাকারী, বিধবার মাথা গোঁজার ঠাঁই, আইন প্রণেতা, বিচারক এবং দুনিয়াবিমুখ দরবেশ। এবং এসব মহৎ মানবিক যোগ্যতা বিবেচনায় মুহাম্মাদ ছিলেন একজন মহানায়ক।"

ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা

মো. মুহিবুর রহমান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে শরঈ বিধান বর্ণনাকারীগণ মুফতী হিসেবে পরিচিত। এ দিক থেকে মুফতীগণ হচ্ছেন রাসূল ﷺ এর সুযোগ্য উত্তরসূরী। এই কাজ যতটা ফদীলতপূর্ণ, ততটা ঝুকিপূর্ণও বটে। পর্যাপ্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া ফাতওয়া প্রদান বর্তমানে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অথচ সালফে সালিহীন উলামায়ে কিরাম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ফাতওয়া প্রদানে ভয় পেতেন। আতা ইবনুস সায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি এমন অনেককে পেয়েছি যে, তাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে যখন তারা কথা বলতেন, তখন কাঁপতেন।" (খতীব বাগদাদী, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ. ৩, পৃ. ২০৫)

এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, রাসূল ﷺ এর সতর্কবাণী। রাসূল ﷺ বলেন,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ.

-তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অধিক দুঃসাহসী, সে জাহান্নামের ব্যাপারেই অধিক দুঃসাহস দেখায়। (সুনান দারিমী, মুকাদ্দিমাহ, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফীহি মিনাশ শিদ্দাতি)

আরেকটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

من أُفتي بغير علمٍ كان إثْمه على من أفتاه

-যাকে অসাবধানতাবশতঃ ফাতওয়া দেওয়া হয়, তার গুনাহ ফাতওয়াদাতার উপরই বর্তাবে। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবুত-তাওয়াক্কি ফিল ফুতইয়া)

ফাতওয়া প্রদানে সাহাবীগণ খুব সতর্ক থাকতেন এবং এই কাজকে রীতিমত ভয় পেতেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা (র.) বলেন, "আমি একশত বিশজন আনসারী সাহাবীকে পেয়েছি যে, তাঁদের কাউকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা একে অপরের কাছে ফিরিয়ে দিতেন। এভাবে ফিরতে ফিরতে মাসআলাটি প্রথম জনের নিকটই আবার ফিরে আসত।" (বাইহাকী, আল-মাদখাল, পৃ. ৪২২; খতীব বাগদাদী, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খ. ২, পৃ. ২০৬)

মানুষকে আল্লাহর বিধান জানাতে হবে। আর ফাতওয়া প্রদান করার মাধ্যমে এই কাজ সম্পাদিত হয়। তাহলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কিছু লোক এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেউই যদি ফাতওয়া না দেন, তাহলে যারা শরঈ জ্ঞানের অধিকারী নন, তারা কোথায় যাবে! সবাই তো কিতাব থেকে মাসআলা উদঘাটন করতে সক্ষম নন। অতএব কিছু লোক দক্ষতার সাথে ফাতওয়া প্রদান করতে হবে। ভালোভাবে বুঝে-শুনে, গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ফাতওয়া দিতে হবে।

খুব আফসোস হয় বর্তমানে অনেকেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়া শুধু কয়েকটি কিতাব পড়ে ফাতওয়া দেওয়া শুরু করে দেন। মাসআলা জিজ্ঞাসা মাত্রই জবাব দিয়ে দেন, একটু চিন্তা-ভাবনা করে ফাতওয়া দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেন না। তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুফতীগণ যদি মাসআলা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন, তাদের ব্যাপার ভিন্ন।

যারা সকল মাসআলার উত্তর দিতে খুব ভালোবাসেন এবং মনে করেন যে, মাসআলার উত্তর দিতে না পারলে ইজ্জত যাবে, তাদের জন্য দু'জন বিশিষ্ট সাহাবীর বক্তব্য পেশ করছি। হযরত ইবন মাসউদ (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি তাকে যা জিজ্ঞাসা করা হয়, সকল বিষয়েই ফাতওয়া দেয়, সে পাগল।" (ইবন আব্দিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, খ. ২, পৃ. ১৬৪ ; বাইহাকী, আল-মাদখাল, পৃ. ৪৩২)

সাহাবী ও তাবিঈগণ (রা.) ছিলেন নববী যুগের নিকটবর্তী লোক। তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে অন্য যে কোনো যুগের মানুষের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন দ্বীনি ইলমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা সরাসরি ওহীর ঘ্রাণ লাভ করেছিলেন, শরঈ হুকুম-আহকাম তাঁদের সামনে ছিল পরিষ্কার। তবুও তারা ফাতওয়া দেওয়াকে খুব ভারী কাজ মনে করতেন। তারা চাইতেন, অন্য কেউ এই দায়িত্ব পালন করলে তিনি দায়মুক্ত হলেন। অথচ এখনকার মানুষ মাদরাসায় কিছুদিন পড়লেই নিজেদের বড় আলিম মনে করেন, দু'চারটি ফাতওয়ার কিতাব মুতালাআহ করে নিজেকে মুফতী মনে করে অনর্গল ফাতওয়া প্রদান করেন। এটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

মুফতী হতে হলে কোনো একজন বা কয়েকজন অভিজ্ঞ মুফতীর তত্ত্বাবধানে থেকে অনুশীলন করতে হবে। শাইখের শিষ্যত্ব ও সাহচর্য ছাড়া শুধু কিতাব পড়ে মুফতী হওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য মেয়াদে যোগ্যতাসম্পন্ন শাইখের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে করতে যখন কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জিত হবে, তখন শাইখের অনুমতি নিয়ে সতর্কতার সাথে ফাতওয়া প্রদান শুরু করতে হবে।

আল্লামা ইবন হাজার (র.) এর ফাতওয়ায় রয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো-উস্তাযের

নিকট নয় বরং কেউ যদি নিজে নিজে ফিকহের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে, পড়ে এবং সে তার অধ্যয়ন ও পড়ার উপর নির্ভর করে ফাতওয়াও দেয়, তাহলে এটা কি তার জন্য জায়িয হবে? তিনি উত্তর দিলেন, কোনোক্রমেই তার জন্য এটা জায়িয হবে না। কারণ সে তো একজন সাধারণ মানুষ, গণ্ডমূর্খ; সে কী বলছে, তা নিজেই বুঝে না। বরং যে নির্ভরযোগ্য উস্তাযদের কাছে ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছে, তার জন্যও দু'এক কিতাব দেখে ফাতওয়া দেওয়া জায়িয নয়। ইমাম নববী (র.) তো বলেন, দশ-বিশ কিতাব দেখেও ফাতওয়া দেওয়া জায়িয নয়। কারণ দশ-বিশ কিতাবের লেখকও অনেক ক্ষেত্রে কোনো দুর্বল একটি মতের উপর নির্ভর করে ফেলেন। দুর্বল মতের তাকলীদ করা তো জায়িয নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি ফিকহশাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ, যিনি নির্ভরযোগ্য উস্তাযদের কাছ থেকে ফিকহশাস্ত্র অর্জন করেছেন, তাঁর মধ্যে ফিকহের স্বভাবগত যোগ্যতা তৈরি হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তি সঠিক ও বেঠিকের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, মাসআলাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে জানতে সক্ষম, এ ধরনের লোকই মানুষকে ফাতওয়া দিতে পারেন। (ইবনু আবিদীন শামী, শারহু উকুদি রাসমিল মুফতী, পৃ. ৬৩-৬৪)

নিজে নিজে কিতাব পড়ে মাসআলার জবাব দেওয়ার চেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের মতন (টেক্সট) উল্লেখ করে "আমি মনে করি এটা এরকম" টাইপের ব্যাখ্যা দিয়ে ফাতওয়া দিয়ে দেওয়া। এরকম না করে সাহাবা-তাবিঈন বা মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা জরুরি। কেননা ইলমে দীন অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে নবী ﷺ থেকে সাহাবীগণ (রা.), তাঁদের থেকে তাবিঈগণ (র.) এবং মুজতাহিদগণ (র.) এই ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

শরঈ হুকুম-আহকাম বিষয়ে কথা বলতে সতর্কতা অবলম্বন খুব জরুরি। কারণ একটি ফাতওয়ার মাধ্যমে কোনো হালাল জিনিসকে কেউ হারাম মনে করবে, আবার কোনো হারাম জিনিসকে হালাল মনে করবে।

এ প্রসঙ্গে শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আব্দুল্লাহ (রা.) কে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা হারাম করেছেন, তা আমি হারাম করতে অথবা আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন, তা আমি হারাম করতে অপছন্দ করি।" (সুনানুদ দারিমী, মুকাদ্দিমাহ, বাবু মান হা-বাল ফুতইয়া)

বর্তমানে না জেনে ফাতওয়া প্রদানের যে হিড়িক দৃশ্যমান হচ্ছে, তা মূলত কিয়ামতের আলামত। এই আলামত সম্পর্কে রাসূল ﷺ আমাদের সতর্ক করে গেছেন। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফাতওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু কাইফা ইয়ুকবাদুল ইলমু)

ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা হচ্ছে, না জেনে এবং চিন্ত-ভাবনা না করে ফাতওয়া না দেওয়া। আর যে সব মাসাঈল মুজতাহিদগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সে সব মাসাঈল সাধারণ আলিমগণ মানুষের কাছে বয়ান করতে পারবেন; এটা ফাতওয়া প্রদান নয়, এটা হবে মুফতীদের ফাতওয়া বর্ণনা করা। আর সাহাবী-তাবিঈগণ (রা.) এর যে সব বর্ণনা উল্লেখ করা হলো, তা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। তাঁরাও ফাতওয়া দিয়েছেন, এমনকি তাৎক্ষণিক ফাতওয়াও দিয়েছেন। তাঁরা যদি ফাতওয়া কার্যক্রম পরিচালনা না করতেন, তাহলে দীনের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব চলে আসত। তাঁদের ভয় পাওয়া দেখে আমাদের সাবধান হতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যোগ্য লোকদের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত।

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব
টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601

আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতায় ফিরল তালেবান

■ রহমান মুখলেস

আফগানিস্তান এখন তালেবান নিয়ন্ত্রণে এবং তারা সরকার গঠনের পথে। কাবুল দখলের পর তালেবান সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত তারা দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা করেনি। তবে তিন জন মন্ত্রীর নাম ঘোষনা করেছে। এরা হলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা আব্দুল কাইম জাকির, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাদর ইব্রাহিম এবং অর্থমন্ত্রী গুল আগা। এছাড়া গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নাজিবুল্লাহ, কাবুলের মেয়র হিসেবে হামদুল্লাহ নোমানি এবং কাবুলের গভর্নর হিসেবে মোল্লা শিরিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

কাতারের দোহা থেকে তালেবানের শীর্ষ নেতারা কাবুলে ফেরার পরই সরকার গঠনের তৎপরতা শুরু হয়। তালেবান গণতন্ত্র নয়, ইসলামী শরীআহ আইনে দেশ চালাবে। তারা আগের মতো খুব কঠোর হবে না। শরিয়া আইন মেনে নারীরা পড়াশুনা, স্কুলে যাওয়া ও অফিসে কাজের অনুমতি পাবে। তবে অবশ্যই তাদের হিজাব পরতে হবে। কারো প্রতি প্রতিশোধ নেবেনা তালেবান। শরিয়া আইনে দেশ চললেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকবে, আফগান ভূমি বিদেশে হামলা চালানোর জন্য সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল হবে না। সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়–এই হবে তালেবানের নীতি।

তালেবানের সরকার হবে অংশগ্রহণমূলক। এতে তালেবান ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি ও সংগঠন যুক্ত হতে পারে। এমনকি সরকারে সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইকেও দেখা যেতে পারে। তালেবানের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ওয়াহিদুল্লাহ হাশিমি সম্প্রতি জানান, এটা পরিষ্কার শরীআহ আইন মোতাবেকই দেশ চলবে এবং এটাই ঠিক। দেশ পরিচালনায় একটি সর্বোচ্চ কাউন্সিল থাকবে। তালেবানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুনজাদা থাকবেন এই কাউন্সিল ও দেশের মূল নেতৃত্বে। তবে অধীনে থেকে সম্ভবত দেশ চালাবেন তালেবানের রাজনৈতিক শাখার প্রধান আবদুল গনি বারাদার। তাঁর সঙ্গে থাকবেন আরো দুজন ডেপুটি। তাঁরা হলেন, মোল্লা ওমরের ছেলে মৌলবী ইয়াকুব, হাক্কানির নেতা সিরাজুদ্দিন হাক্কানি। তবে এ সবই এখন জল্পনা। এর পরিবর্তনও হতে পারে। আবদুল গনি বারাদার দোহাতে তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং আশরাফ গনি সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। তিনি তালেবানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের ডেপুটি এবং ১৯৯৬–২০০১ সালের তালেবান সরকারের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১০ সালে পাকিস্তানে গ্রেপ্তার হন। পরে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে গনি বারাদারকে ছেড়ে দেয় পাকিস্তান। মুক্তি পেয়েই তিনি সোজা চলে যান কাতারের দোহায়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শান্তি আলোচনায় অংশ নেন। এর আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান শাসন করেছিল তালেবান। সে সময়েও দেশটিতে শরীআহ আইন জারি ছিল। তবে তাতে কিছু বাড়াবাড়িও ছিল। তখন মাত্র তিনটি দেশ- সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

আফগানরা হার না মানা জাতি

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ট্রাজেডি যে, ভিয়েতনামের পর আফগানিস্তান থেকেও বড় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরতে হলো। ইতিহাস সাক্ষী স্বাধীনচেতা আফগানদের ধরে রাখা বা পদানত করার নযীর এ পর্যন্ত নেই। ব্রিটিশ পারেনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন পারেনি, যুক্তরাষ্ট্রও পারলোনা। ১৮ শতাব্দীর শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বার বার চেষ্টা করেছে পুরো আফগানিস্তানকে কব্জা করতে কিন্তু পারেনি। আফগানিস্তানের সামান্য কিছু এলাকা নিজেদের শাসনভূক্ত করতে পারলেও বার বার তারা লড়াইয়ে পরাস্ত হয়েছে। ভারত–পাকিস্তানের অনেক আগেই ১৯২১ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে আফগানিস্তান।

এরপর আফগানদের ওপর আগ্রাসন চালায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা তাদের কমিউনিজমের আদর্শের বার্তা নিয়ে আসে আফগানিস্তানে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত সেনারা প্রবেশ করে দেশটিতে। বারবাক কারমাল, হাফিযুল্লাহ আমিনসহ তাদের বেশ কজন পদলেহী দিয়ে আফগানিস্তানে কমিউনিজম বাস্তবায়নের চেষ্টা চলায়। কিন্তু সে সময় বিভিন্ন মুজাহিদীন গ্রুপ সোভিয়েত সেনা ও আফগান শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হয়ে ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে পাততাড়ি গুটায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে ৯/১১ হামলার পর বিন লাদেন ও সন্ত্রাস উৎখাতের নামে ২০০১ সালের শেষের দিকে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোট হামলা শুরু করে। তখন দেশটির ক্ষমতায় ছিল তালেবান। আল–কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন ছিল তাদের আশ্রয়ে। হামলার কয়েকদিনের মধ্যেই ২০০১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পতন ঘটে তালেবান সরকারের। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে এসেছিল তাদের আদর্শ (কমিউনিজম) বাস্তবায়নে, আর ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র এসেছিল স্রেফ দখলদার ও আগ্রাসী শক্তি হিসেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই তিন পরাক্রমশালী শক্তিকেই লজ্জাজনক হার নিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে।

ভুল হিসাব যুক্তরাষ্ট্রের

প্রায় ২০ বছর আগে কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের নামে মিত্র দেশের সেনা ও ন্যাটো বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। দ্রুতই দেশটির তৎকালীন ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের পতন ঘটায়। কিন্তু তালেবানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই আর আফগানিস্তানজুড়ে সহিংসতার অবসান কখনোই ঘটেনি। দেখা মেলেনি প্রত্যাশিত শান্তি। দুই দশক তাড়া খেয়ে বেড়ানো তালেবানই শেষ পর্যন্ত ফিরে এলো ক্ষমতায়।

তালেবানের সাহসী, সুপরিকল্পিত, ঝোড়োগতির আক্রমণের মুখে আফগান সেনাবাহিনী কোথাও তেমন প্রতিরোধই গড়ে তোলেনি। অনেক প্রদেশ ও শহর বিনা বাধায় দখল করেছে তালেবান। ৬ আগস্ট প্রথম জারাঞ্জ প্রদেশ দখলের মধ্য দিয়ে তালেবানের যে অভিযান শুরু হয়েছিল, তারপর মাত্র ৯–১০ দিনের মধ্যেই ১৫ আগস্ট কাবুল দখল করে তালেবান। এতে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, পুরো বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গত ২০ বছরের অর্জন এত দ্রুত বিধ্বস্থ হয়ে পড়বে তা ভাবনারও অতীত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র গত দুই দশকের যুদ্ধে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যাপক প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছে। এতে তারা ৮ হাজার ৩০০ কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করেছে।

তালেবান অভিযান শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যের অনুমান ছিল, ৯০ দিনের মধ্যে কাবুলের পতন ঘটতে পারে। কিন্তু তা যে ৯–১০ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সেটা ছিল কল্পনারও অতীত। তালেবানের এমন শক্তির আত্মপ্রকাশে বিস্মিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন । তিনি বলেন, যা ঘটার তাই ঘটেছে, আফগান সেনাদের যুদ্ধ করার কোন মানসিকতাই ছিল না। তিনি আরও বলেন, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিল ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা ও আল–কায়েদাকে খতম করতে, সে খেল শেষ। এখন আফগানিস্তানের দায়–দায়িত্ব আফগানদের। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আফগানিস্তানে যাওয়াটা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুল। আবার এভাবে পরাজয় মনে ফেরাটাও বাইডেনের ভুল সিদ্ধান্ত।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সন্ত্রাসী দমনের নামে ২০০৩ সাল থেকে আফগানিস্তানে প্রায় ২৭ হাজার বোমা নিক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

শুধু গত বছরই ৭ হাজার ৪০০ বোমা নিক্ষেপ করেছে তারা। কিন্তু গত মার্চ মাসে জো বাইডেনের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার থেকে সেখানে তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তালেবানের নিশানায় ছিল কেবল আফগান সেনারা। আর তালেবানের এ অভিযানে মার্কিন সেনারাও থাকে নির্বিকার।

তালেবানের জয় যে কারণে এত দ্রুত

আমরা আগেই জেনেছি আফগানরা হার না মানা জাতি। এত দ্রুতগতিতে তালেবানের অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র ও সারা বিশ্ব বিস্মিত হলেও ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটাই ছিল বাস্তবতা। আফগানরা বিদেশি শক্তি কখনো বরদাস্ত করেনি। তারা হার না মানা এক জাতি। মার্কিন সমর্থিত বিগত আশরাফ গণি কিংবা হামিদ কারজাই সরকার কেউই আফগান জনগণের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও দুঃখ–দুর্দশার দিকে নযর দেয়নি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল আফগানিস্তানে তাদের নিজস্ব ফর্মূলায় একটি আধা–মার্কিন বাহিনী গড়ে তুলতে। এভাবে তারা আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরঞ্জাম দিয়েছে। কিন্তু আফগান অধিকাংশ সেনাদের কাছেই এই ফর্মূলা মনপূত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পেলেও দুর্নীতিবাজ আফগান সরকার অনেক সেনা ও পুলিশ সদস্যদের মাসের পর মাস নিয়মিত বেতন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে সরকারি বাহিনীর মধ্যে ঘটেছে বিদ্রোহের মতো ঘটনাও।

এদিকে তালেবানের মতো একটি সংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে লড়াই করতে সেনাদের তেমন মনোবল ও ইচ্ছা ছিল না। এছাড়া সেনা কর্মকর্তাদের ভেতরেও গড়ে উঠেছিল দুর্নীতির লম্বা শিকড়। আফগান সেনাদের দুঃখ–দুর্দশা ও চাহিদার দিকে কখনো নযর দেওয়া হয়নি। সাধারণ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে চেয়েছে সেনা সদস্যরা। আর অনেক সেনারই সমর্থন ছিল তালেবানের প্রতি। তালেবান হচ্ছে আফগানিস্তানের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি পশতুন সম্প্রদায়ের লোক। আর অধিকাংশ সেনারাও ছিল পশতুন সম্প্রদায়ের। এমনকি বিদায়ী আশরাফ গণিও ছিলেন পশতুন সম্প্রদায়ের। কিন্তু আশরাফ গণির সরকারের দুর্নীতির কারণে সেনারা ছিল বিক্ষুব্ধ। ফলে অধিকাংশ সেনারই তালেবান মুকাবেলার মতো সামান্যতম সাহস বা শক্তি কোনোটিই ছিল না। তাই তারা যুদ্ধের মাঠে তালেবানের ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে, অথবা পালিয়ে গেছে। এছাড়া তালেবান তাদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল আত্মসমর্পণ করলে কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

তালেবানের দ্রুত জয়ের মূলে আরও যে একটি কারণ, তা হচ্ছে ব্যাপক জনসমর্থন। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকজনেরই সমর্থন ছিল তালেবানের প্রতি। বিশেষ করে গ্রাম এলাকার লোকজনের।

পশতুন ছাড়াও আফগানিস্তানে আরো রয়েছে তাজিক, উজবেক, হাজারা, তুর্কিসহ আরও বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাদেরও কিছু অংশের সমর্থন ছিল তালেবানের প্রতি। আসলে জনগণের ব্যাপক সমর্থন ছাড়া কখনো এত দ্রুত বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না। যেমন ব্যাপক জনসমর্থনের কারণেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিজয় হয়েছিল দ্রুত। আর আমরা সেই ইরানেও একই দৃশ্য দেখেছি, মার্কিন সমর্থন পুষ্ট শাহ পাহলভির বিশাল সেনা বাহিনী ও ট্যাংকের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের মুখে বিজয় অর্জন হয়েছিল নিরস্ত্র আয়াতুল্লাহ খোমেনীর। এটাই ইতিহাস। জনসমর্থনের বিপরীতে থেকে কখনো বিজয় অর্জন করা যায় না। হয়তো সাময়িকভাবে ক্ষমতায় থাকা যায়। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

এদিকে কূটনীতিকদের অনেকে মনে করেন আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিল ক্ষমতা ও অহংয়ের লড়াইয়ে আর তালেবানের কাছে ছিল শিকড় রক্ষার লড়াই। তালেবানের জয়ের এটিও এক অন্য দিক।

তাই যত বার আঘাত নেমে এসেছে, ভূপতিত হয়েও বার বার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তালেবান। গুলি-বোমায় একজন তালেবান মারা গেলে তাঁর জায়গায় আরও ১০ জন এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু সক্রিয় তালেবান যোদ্ধার সংখ্যা খুব বেশি নয়। আফগান সেনা–পুলিশ ও বিমানবাহিনীর প্রায় তিন লাখ সেনার তুলনায় ছিল খুবই কম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের অনুমান, বর্তমানে আফগানিস্তানে সক্রিয় তালেবান যোদ্ধার সংখ্যা মাত্র ৬০ হাজার।

বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে এই স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধা দিয়ে জয় তখনই সম্ভব যখন থাকে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন। এদিকে ২০ বছরের লড়াইয়ে প্রায় ৭০ হাজার আফগান সেনা মারা গিয়েছেন বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার তথ্য থেকে জানা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের খালি হাতে ফেরা ও লুণ্ঠিত ভাবমূর্তি

শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে খালি হাতেই ফিরতে হলো যুক্তরাষ্ট্রকে। সে সাথে ললাটে জুটলো ভিয়েতনামের পরাজয়ের চেয়েও আরেক বড় পরাজয়ের গ্লানি। 'টুইন টাওয়ারে হামলার প্রতিশোধ' নিতে বিন লাদেন উৎখাতে আফগানিস্তানে তাদের ২০ বছরের আগ্রাসন এক লহমায় শেষ। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের হারার আরো একটি কারণ আসলে অহংয়ের লড়াই লড়তে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তালেবানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২০ বছরের লড়াইয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে হাজার হাজার জওয়ানের দেহ কফিনবন্দি করে, দেশের ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধ শেষ করে খালি হাতেই আফগানিস্তান থেকে ফিরে গেল যুক্তরাষ্ট্র।

পেন্টাগন থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ২০ বছরে আফগানিস্তানে যুদ্ধের পিছনে ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি ডলার খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে শুধুমাত্র আফগান সেনাকে প্রশিক্ষণ দিতেই খরচ হয়েছে ৮ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। ২০২০ সালের একটি রিপোর্টে পেন্টাগন জানায়, সরাসরি

যুদ্ধেই তাদের ৮৭ হাজার ৫৭০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে।

পেন্টাগন রিপোর্ট থেকে আরও দেখা যায়, নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে আফগানিস্তানে গিয়ে প্রায় ৪ হাজার জন মার্কিন সেনা মারা গেছেন। গুরুতর জখম হয়ে ফিরেছেন আরো ২০ হাজার ৬৬৬ জন। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন এই দীর্ঘ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মতে, ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আফগানিস্তান থেকে আগেই সরে যাওয়া উচিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। সন্ত্রাস রোধ, গণতন্ত্র, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরে। ২০ বছরের যুদ্ধে আফগানিস্তানে শুধুই ধ্বংসস্তুপ রেখে গেল যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আফগানিস্তানে তাদের যাওয়াটা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল। আর ন্যাটোর প্রধান বলেছেন, আফগানিস্তান থেকে আজ ন্যাটো ও সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে।

তালেবান নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের মনোভাব

তালেবানের বর্তমান অগ্রযাত্রাকে শুরু থেকেই সমর্থন করে আসছে পাকিস্তান, চীন ও রাশিয়া। তালেবানের কাবুল দখলের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেন, 'দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছে আফগানবাসী। তিনি বলেন, আপনি যখন অন্যদের সংস্কৃতি সেরা মনে করে গ্রহণ করবেন, তখন দিনশেষে এর দাসে পরিণত হবেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল আফগানিস্তান পাকিস্তানসহ সমগ্র অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

তালেবানের প্রতি উদার মনোভাব চীনেরও। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই সম্প্রতি (১৯ আগস্ট) বলেছেন, চাপ দেওয়ার বদলে বিশ্বের উচিত তালেবানকে সমর্থন করা। তিনি বলেন, আফগানিস্তানকে ভূ -রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় বরং তার স্বাধীনতা এবং জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান করা উচিত। তালেবানের অগ্রাভিযান শুরুর প্রথম দিকে গত জুলাই মাসে উত্তর চীনের তিয়ানজিন শহরে তালেবান নেতা আবদুল গণি বারাদার ও মুখপাত্র সুহাইল শাহিনের নেতৃত্বে আসা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। বহুদিন ধরেই তালেবানের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালাচ্ছিল বেইজিং। চীন তালেবানকে সরাসরি স্বীকৃতি না দিলেও চীন বরাবরই তালেবানের পক্ষে বলে আসছে।

এদিকে আফগানিস্তান পুনর্গঠনে অংশ নিতে চীনকে স্বাগত জানিয়েছে তালেবান। দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চীনের ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে তারা। সম্প্রতি চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল সিজিটিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তালেবানের মুখপাত্র সুহাইল শাহিন। সিজিটিএনকে সুহাইল শাহিন বলেন, 'চীন একটি বড় দেশ। তাদের বিশাল অর্থনীতি ও সক্ষমতা রয়েছে। আমি মনে করি, আফগানিস্তান পুনর্গঠনে তারা বড় ভূমিকা রাখতে পারে।'

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশটিকে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে এবং দেশটি নিয়ে পশ্চিমাদের প্রতি নাক না গলানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে 'বাইরে থেকে মূল্যবোধ' চাপিয়ে দেওয়া হবে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন'। আর প্রয়োজনে তালেবানের সঙ্গে অবশ্যই কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তিনি বলেছেন, 'আমি মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, আফগানিস্তানের জন্য একটি সমাধান বের করতে আমাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা থাকবে।'

জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল বলেছেন, আফগানিস্তানের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ তালেবান মুভমেন্টের নিয়ন্ত্রণে, এটাই বাস্তব। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ও আফগানিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে পড়া প্রতিরোধে নিতে হবে পদক্ষেপ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র শর্ত সাপেক্ষে তালেবানকে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তালেবান মানবাধিকার, নারী অধিকার, সকল পক্ষকে নিয়ে সরকার গঠন এবং আফগান ভূমিকে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল না করলে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে।

তুরস্কের সাড়াও এক্ষেত্রে ইতিবাচক। তালেবানের মুখপাত্র সুহাইল শাহিন বলেছেন, আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের জন্য তুরস্ককে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেছেন, আফগানিস্তান বিষয়ে আমরা সকল পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছি। আফগানিস্তানকে ভেঙ্গে পড়তে দেওয়া যাবে না। এছাড়া ভারত কাবুলের নতুন প্রশাসনের আচরণ দেখে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে। ভারত পরিস্থিতির দিকে নযর রাখছে।

আর্থিক ও খাদ্য সংকটের মুখে

আফগানিস্তানে ক্ষমতায় বসেই তালেবান বড় আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আটকে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র জার্মানি এবং অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থা আফগানিস্তানে তাদের আর্থিক সহায়তা স্থগিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিলও (আইএমএফ)দেশটির জন্য তাদের বরাদ্দ আটকে দিয়েছে। এ অবস্থায় শাসনকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়ে অনেক কম অর্থকে পুঁজি করে তালেবানকে তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে সংকটের মুখে পড়েছে ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ খাদ্যসংকটে রয়েছে। এতে করে ভয়াবহ মানবিক সংকটের মুখে পড়তে পারে আফগানিস্তান। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি)কান্ট্রি প্রধান মেরি এলেন ম্যাকগ্রোয়ার্টি সম্প্রতি বলেন, পশ্চিমাদের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ায় দেশটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। খরা ও বিভিন্ন কারণে দেশটির ৪০ শতাংশ শস্য ধ্বংস হয়ে গেছে। গত তিন বছরের মধ্যে আফগানিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো খরা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া করোনার কারণেও দেশটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে।

তালেবানের সামনে যত চ্যালেঞ্জ

২০ বছর পর ফের আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান। যুদ্ধে জেতা যত সহজ, শান্তি রক্ষা ও দ্বিধাবিভক্ত ও সংঘর্ষ জর্জরিত একটি দেশকে শাসন ও দাঁড় করানো তত কঠিন। এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা। শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই তারা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন আশরাফ গণির সরকার জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তালেবান ইতোমধ্যে ব্যাপক সামরিক শক্তি অর্জন করেছে সত্যি, কিন্তু সঠিকভাবে এই শক্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালন এবং তা ধরে রাখা এখন তাদের জন্য আরো একটি চ্যালেঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিশেষজ্ঞ জোনাথন শ্রোডেন বলেন, তালেবান কার্যকরভাবে শাসন ক্ষমতা এখনো দেখাতে পারেনি। আন্তর্জাতিক বিশ্বস্ততা অর্জনে আল-কায়েদা ও আইএস ঠেকানোর কার্যকর দক্ষতা দেখাতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে আল-কায়েদার কারণেই অতীতে তাদের ওপর হামলা ও পতন হয়েছিল। এছাড়া এখন মানবাধিকার নিয়ে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। এর মধ্যে নারীদের শিক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত। আফগানিস্তান বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি। তাই অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন হবে। চীন তাদের পাশে থাকলেও অন্যান্য দাতা দেশের সাহায্যও তাদের প্রয়োজন।

পরিশেষে সব সংকট কাটিয়ে তালেবান সামনে এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের সামনে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আফগানিস্তান উপহার দেবে এটাই সবার কাম্য।

আলোকপাত

তালেবান নিয়ে কিছু কথা

আবূ যাকওয়ান

কিছুদিন আগে তালেবান কাবুল দখল করলে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা বিশ্ব এটাকে তাদের পরাজয় ভেবে নানাভাবে তালেবানের ব্যাপারে তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আবার মুসলিম মানসেও কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

পশ্চিমাদের বিরোধটা কোথায়?

অনেকে মনে করেন পশ্চিমারা নারী অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীতার কথা বলে, তাহলে এটা মানতে অসুবিধা কী? কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু নারী অধিকারের সংজ্ঞা কী সেটা খুবই বিবেচ্য। এখন যদি বলা হয় সমলিঙ্গদের বিবাহের অধিকার হচ্ছে নারী অধিকার বা রাস্তাঘাটে ও চুলকাটার দোকানে অর্ধ উলঙ্গ নারীর ছবি রাখা নারীর মর্যাদার প্রতীক তাহলে এটা তালেবান কেন, ইসলামের অনুসারী ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কেউই একমত হতে পারবে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধরন ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি। যেমন অগণিত মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয়নবী ﷺ কে নিয়ে কার্টুন ছাপা, 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা', আবার একই দেশে তাদের প্রেসিডেন্টের কার্টুন ছাপলে তা 'মানব অধিকার লঙ্ঘন', এমন দ্বিচারী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে কী বলা যায়?

গণতন্ত্র শুধু কি আফগানিস্তানে প্রয়োজন?

যারা আফগানিস্তানে গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্না করেন তারাই আবার মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রের ব্যাপারে চুপ। আর নিজের পছন্দ না হলে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করে সেনা শাসনেও তাদের আপত্তি নেই! উদাহরণ হিসেবে মিসরের কথা বলা যায়। গণতন্ত্র অর্থ যদি হয় বেশির ভাগ জনগণের চাওয়া তাহলে তালেবানের শরীআহ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগকে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। কারণ পিউ রিসার্চ এর জরিপ অনুযায়ী আফগান মুসলমানদের ৯৯% শরীআহ আইন চায়।

ইসলামী আন্দোলনের গণতন্ত্রপন্থিরা কি বিব্রত?

প্রথমেই বলতে হয় গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। গণতন্ত্র যদি হয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ চালানো, মানবাধিকারের সুরক্ষা তাহলে ইসলামের সাথে এর বিরোধ নেই। কিন্তু গণতন্ত্র অর্থ যদি হয় মানুষের সর্বোত সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস ইত্যাদি তাহলে বিশ্বাসগত পর্যায়ের বিচ্যুতির কারণে ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

যাই হোক গত শতাব্দীকাল থেকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়িম করার প্রচেষ্টা বেশ লক্ষণীয়। কিন্তু এর অভিজ্ঞতা তিক্ত। আলজেরিয়া, তুরস্ক, মিসর, সর্বশেষ তিউনিসিয়া ইত্যাদির দিকে তাকালে এই সমীকরণে আসা খুব স্বাভাবিক যে গণতান্ত্রিকভাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কায়িম করা খুবই মুশকিল।

আলজেরিয়ার কথা হয়তো অনেকের মনে আছে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচিত হওয়ার পরও সেনাবাহিনী একদিনের জন্যও ক্ষমতায় ইসলামপন্থিদের বসতে দেয়নি।

মিসরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুরসি এক বছরের বেশি টিকতে পারেন নি। তুরস্কের অভিজ্ঞতা আরো তিক্ত। বহু গণতান্ত্রিক-সহনশীল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বকে সেক্যুলার সেনাবাহিনী সরকার চালাতে দেয়নি। আদনান মেন্দেরেস এর ফাঁসি (১৯৬১) ও নাজমুদ্দীন আরবাকান এর সেনাবাহিনীর হাতে পদচ্যুতি (১৯৯৭) আজ ইতিহাসের কালো অধ্যায়। আর তিউনিসিয়ার খুবই নমনীয় আপোষকামী সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতাতো সেদিনের। পক্ষান্তরে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইরানী ইসলামী (শিয়া) সরকার হাজার বাধায়ও মাথা উঁচু করে আছে। যদিও আকীদাগত কারণে আমাদের সাথে শিয়াদের মতভিন্নতা সর্বজনবিধিত। আর তালেবান বিপ্লবী ধারার মাধ্যমে ২০ বছর পর আবার ক্ষমতায়। শুনা যায় আমাদের দেশের গণতন্ত্রপন্থি, আধুনিক মনস্ক, লিবারিজমে বিশ্বাসী কেউ কেউ মনজ্বালায় ভুগছেন। এটা উচিত নয়, ইসলামের বিজয় যেখানে হোক নিজের দল ও ধারার না হলেও খুশি হওয়া উচিত। অবশ্য এ কথা ঠিক পৃথিবীর সব দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্ণ উপযোগী কি না সেটাও আলোচনার দাবি রাখে।

আবার আমাদের মধ্যে এমন সুবিধাবাদীও রয়েছেন যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ রাখেন না। গণতান্ত্রিক হোক আর বিপ্লবী হোক, তাদেরকে নিয়ে কিছু বলার নেই। কারণ তাদের কাছে ইসলামের স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না।

তালেবানরা কোন পন্থি?

যতটুকু জানা যায় তালেবানরা সুন্নী, হানাফী, সূফী অর্থাৎ তারা আকীদায় মাতুরীদি, মাযহাবে হানাফী এবং তাযকিয়া-তাসাউফ চর্চায় অভ্যস্ত। বিশেষত: তাদের সূরা নসর পড়ে বিজয় উদযাপনের শেষপ্রান্তে সারা বিশ্বে সূফীদের কাছে সমাদৃত ও বহুল পঠিত বিখ্যাত ওয়াযীফাগ্রন্থ 'দালাইলুল খাইরাত' থেকে দুরূদ পাঠ তাদের তাসাওউফ চর্চার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ থেকে দুটি কথা বলা যায়, প্রথমত; তালেবানরা 'দুরূদে ইবরাহীমী ছাড়া আর কোন দুরূদ নেই বা পড়া যাবে না' তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। দ্বিতীয়ত; রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সূফীরা কোন ভূমিকা রাখেন না এ অপপ্রচারের পক্ষে অতীত ইতিহাসে যেমন সমর্থন নেই তেমনি তালেবানের বিজয়ও এ তথ্যকে ভুল প্রমাণ করে।

তালেবানের ভবিষ্যৎ কী?

একটি দেশ পরিচালনা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরীন পরিস্থিতি, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক পথপরিক্রমা এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। সবাই জানেন আফগানরা জাতি হিসেবেই যুদ্ধপ্রেমী, আবার তাদের দেশে আঞ্চলিক ও গোষ্টিগত নানা বিভাজন রয়েছে। যেমন-পশতুন, তাকিজ, হাজারা ইত্যাদি। সুতরাং এ বিষয়ে তালেবানরা কীভাবে 'ডিল' করবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই মনে করেন তালেবানের প্রথম শাসনামলে কিছু বিষয়ে তাড়াহুড়া বা অপরিপক্কতা ছিল। এবারে তারা অনেক 'পরিপক্ক'। তাই তারা পূর্বের মতো অপরিপক্ক কোন কাজ করবেনা আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে তালেবানরা বহুমুখী চাপে থাকবে এটা নিশ্চিত। কারণ, ইতোমধ্যে অর্থনীতির দুই বিশ্বমোড়ল ফেডারেল ব্যাংক ও আইএমএফ তালেবানের ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থানের কথা জানিয়েছে। আর বৈদেশিক শক্তি বিশেষতঃ পশ্চিমা ও দোসররা তালেবানের উপর খুশি হবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন থেকে দিতে চাই, আল্লাহ বলেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

-আপনার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনই খুশি হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের মতবাদ অনুসরণ করবেন। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২০)

সুতরাং আমাদের ধারণা তালেবান যত লিবারেল হোক পশ্চিমারা পুরোপুরি খুশি হওয়ার আশা নেই। মুমিনের চাওয়া হলো ইসলামের পতাকা হাতে বিজয়ী এ শক্তি যেন সকল বাধা অতিক্রম করে মদীনার সোনালী সময়ের সুবাস বিলাতে সক্ষম হয়।

আফগানিস্তানে পশ্চিমাদের পরাজয়: আমাদের দ্বিচারিতা

হামিদ মাশহুর

তালেবানের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দীর্ঘ বিশ বছরের আফগান যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে গত দুইশ বছরে কাবুলে ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পর তৃতীয় কোন পরাশক্তির পরাজয় ঘটল। পরাজয় যে শুধু মার্কিন বাহিনীর হয়েছে তা নয়, পরাজিত হয়েছে গোটা পশ্চিমা বিশ্বের সম্মিলিত বাহিনী ন্যাটো, পরাজিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতও। আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা ফেরাতে তালেবান কতটুকু সফল হবে, তাদের সরকার কতটা মানবিক হবে, আফগানিস্তান কতটা কল্যাণরাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারবে এসব প্রশ্ন এখন সবার মনেই ঘুরপাক খাচ্ছে। আফগানিস্তানে একটি সুন্দর আগামী নিশ্চিত একথা কেউই আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করবেন বলে মনে হয় না। আমিও নিশ্চিত নই সামনের দিনগুলো কেমন হবে। তবে ততোটা চিন্তিতও নই যতটা ভয়াবহতার আশঙ্কা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।

যেসব আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবর আমাদের সামনে আসে অথবা যেসব মিডিয়া থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেশীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো খবর প্রচার করে তার প্রায় সবগুলোই আফগানিস্তান যুদ্ধের পরাজিত শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। হোক তা বিবিসি, রয়টার্স, সিএনএন কিবা আনন্দবাজার। পরাজিত শক্তির সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব মিডিয়া। যারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে আফগানিস্তানে গত বিশ বছরের মার্কিন আগ্রাসন আফগান জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল এবং বর্তমান তালেবানের উত্থানে আফগানদেরই ক্ষতি। দেশি বিদেশি মিডিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত অনেকেই ভাবছেন হয়তো এখানে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে আমেরিকান সেনার উপস্থিতিই ভালো ছিল। আসলেই কি তাই? তালেবানরা কাবুল দখলের পর প্রত্যাশিতভাবেই ঘোষণা করেছে তারা আফগানিস্তানে শরীআহ আইন বাস্তবায়ন করতে চায়। আর এ নিয়েই মায়াকান্না শুরু হয়েছে পরাজিত শক্তি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী মহলে। তারা চিন্তিত তালেবানের জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা, চুরির জন্য হাত কাটা, নারী স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে। আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাদের শঙ্কা কতটা যৌক্তিক তা এ নিবন্ধে আলোচনা করব পশ্চিমা মিডিয়ার আলোকে।

তালেবানের বিষয়ে স্বদেশে অথবা বিদেশে সব চেয়ে উচ্চকিত নারী অধিকার কর্মীরা বা নারীবাদীরা। তাদের দাবি আফগানিস্তান থেকে মার্কিনসেনা প্রত্যাহার এবং তালেবানের উত্থান সেদেশে নারীদের অধিকার খর্ব করবে। একথা সত্য যে তথাকথিত নারীবাদীরা যেসব অধিকারের অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখেন তা আফগানিস্তান তো নয়ই কোন সভ্য মুসলিম দেশেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তালেবান নারীদের কিভাবে মূল্যায়ন করে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড সানডে এক্সপ্রেস এর নারী সাংবাদিক ইভন রিডলির ইসলাম গ্রহণ থেকে। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ২০০১ সালে তালেবানের হাতে এগারো দিন বন্দি ছিলেন। এ সময়ে তার সাথে তালেবানের আচরণ, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ সব কিছুই বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠেছে তার লেখা 'ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান' বইয়ে। অন্যদিকে আমাদের মিডিয়া এবং নারীবাদীরা আফগান নারীদের অধিকার রক্ষায় যে মার্কিন বাহিনীর উপর আস্থা রাখে তারা নারী বন্দিদের সাথে কী আচরণ করে এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের হাতে বন্দি মুসলিম বিজ্ঞানী আফিয়া সিদ্দিকীর চিঠি থেকে, প্রমাণ পাওয়া যায় বাগরাম কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যারা আফিয়া সিদ্দিকীর আর্তচিৎকার শুনেছেন তাদের থেকে।[১] আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে মার্কিন পশুগুলো কী করেছে তা আমি এখানে লিখব না, লেখার ভাষা আমার নেই, লেখার সাহস আমার নেই।

নারী বন্দিদের বিষয় না হয় বাদই দেওয়া গেলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস[২] এর ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন নারী সেনাদের প্রতি পুরুষদের যৌন হয়রানির ঘটনা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী সহকর্মীদের প্রতি যৌন হয়রানির এই হিসাব শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয় বরং ন্যাটো জোটের সবগুলো বাহিনীতেই লক্ষণীয়। যাদের হাতে নিজের নারী সহকর্মীরাই নিরাপদ নয় তারা করবে নারী অধিকার রক্ষা! যাদের নিজেদের বাহিনীগুলোতেও নারীরা নিরাপদ নয় তারা চিন্তিত আফগান নারীদের নিয়ে! অদ্ভুত! এই যে তথাকথিত সভ্য বাহিনীতেই নারীর প্রতি সহিংসতা, আমাদের নারীবাদীরা কি এসব বাহিনীকে ভয় পান? অবশ্যই না। কারণ কোন মনীষী না বললেও এটাই সত্য 'ভয় থেকে ডলারের শক্তি অনেক বেশি।' সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো আফগান নারীদের অধিকার নিয়ে ভারতীয় সংবাদ পাঠকদের বিকট কণ্ঠের আস্ফালন। তারা ভুলে গেলেও আমরা ভুলিনি সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তোলা চলন্ত বাসে গণধর্ষণের ঘটনা। চলন্ত বাসে নির্ভয়াদের গণধর্ষণের স্বীকার হতে হয় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে, তালেবান নিয়ন্ত্রিত কোন শহরে নয়। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্স[৩] এর রিপোর্ট অনুযায়ী নারীদের বসবাসের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ ভারত, শীর্ষ দশে আছে যুক্তরাষ্ট্রও। সুতরাং এসব দেশ এবং এসব দেশের থেকে আমদানিকৃত নারীবাদে বিশ্বাসীরা নারী-স্বাধীনতা বলতে আসলে কী চায় তা বুঝাই যাচ্ছে।

এবার আসা যাক তালেবানের আফগানিস্তানে কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে। উপরে উল্লেখ করা তথ্য থেকে তথাকথিত সভ্য ও আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে নারী শিক্ষা ও নারীর কর্মসংস্থানের নামে নারীদের অবমাননা করার প্রবণতা সহজেই অনুমেয়। নারীর এমন কর্মসংস্থান মোটেও কাম্য নয়, যেখানে নারীরা নিজের সহকর্মীর ও আশেপাশের সকল পুরুষের লোভের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং এর কোন কার্যকর প্রতিরোধ তৈরি করা হয়না। অন্যদিকে নারীদের কাজের এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও সুস্পষ্ট মানবিকতা বিবর্জিত কাজ। এ অবস্থায় যেকোন নীতিবান সরকারের উচিত হবে নারীদের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দুঃখজনক হলেও সত্য কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তায় শতভাগ সফল বলে কোন রাষ্ট্র দাবি করতে পারবে না। আমরা অপেক্ষায় থাকব তালেবান এই সমস্যার কেমন সমাধান নিয়ে আসে দেখার জন্য। ইসলামী শরীআতের আলোকে দেশ চালানোর ঘোষণা দেওয়া তালেবান যদি সত্যি সত্যি ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত

নারী অধিকার নিশ্চিত করে তবে তা নিঃসন্দেহে নারীর জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিতে রোল মডেল হবে।

মৃত্যুদণ্ড ও হাত কাটার শাস্তি বিষয়ে প্রথমেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র আইন সমান নয়। জাতিগত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ন্যায়-অন্যায় বোধের ভিত্তিতেই দেশে দেশে আইন তৈরি হয়। এজন্য যে অপরাধে উপমহাদেশে শাস্তির বিধান রয়েছে, ইউরোপে তা কোন অপরাধ নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে সম্প্রতি আলোচিত একটি মাদক মামলার কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে মাদক ব্যবহার ও কেনা-বেচার জন্য যেমন শাস্তি হয় ইউরোপে ঠিক তেমন হবে না। কারণ আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আলাদা। একইভাবে একটি দেশ কী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিবে, কিভাবে দিবে এ আইন নিজেদের দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবেই তৈরি হবে। যদি তালেবান এমন কোন কারণে মৃত্যুদণ্ড বিধান করে যা দেশের অধিকাংশ মানুষ মানতে নারাজ সেক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তর থেকেই একটা গণ আন্দোলনের সূচনা হবে, সরকার পতন হবে। এরকম গণ আন্দোলনের মাধ্যমে মহা পরাক্রমশালী রাষ্ট্রনায়কদের পতনের ইতিহাস অহরহ পাওয়া যায়। সুতরাং মৃত্যুদণ্ড কিবা চুরির শাস্তি আটকে দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোন মোড়লের উপস্থিতির সাফাই গাওয়া অমূলক। আফগান জনগন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন ন্যাটোকে ডেকে নেয়নি তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য।

চুরির জন্য হাত কাটা নিয়ে যেসব পশ্চিমা মিডিয়া অতিরিক্ত মায়াকান্না করছে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দ্য গার্ডিয়ান[৪] পত্রিকার ২০১০ সালের একটি রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে মার্কিন সেনা কর্তৃক কোন কারণ বা যুদ্ধের উস্কানি ছাড়াই শুধু আনন্দের জন্য আফগানিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের হত্যা এবং হত্যা শেষে বিজয় চিহ্ন হিসেবে তাদের আঙ্গুল কেটে নিয়ে আসার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আফগান জনগণের হাত কাটা যাওয়ার কষ্টে পশ্চিমাদের মায়াকান্নায় কেমন করে প্রভাবিত হই যাদের নিজেদের সৈন্যরা নিছক আনন্দের জন্য নিরীহ, নিরস্ত্র আফগানদের হত্যা করত এবং আঙ্গুল কেটে নিয়ে আসত!

আফগানিস্তানে মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা নিয়েও অনেকে চিন্তিত। এ বিষয়ে প্রথমেই যে প্রশ্ন সামনে আসে তা হলো সর্বশেষ কবে আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ মানবাধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল? গত বিশ বছরে কি এর কোন অস্তিত্ব ছিল? সহজ উত্তর এসবের কোন অস্তিত্ব অন্তত গত বিশ বছরে আফগানিস্তানে ছিল না। কেন ছিলনা তা ইতোমধ্যে উল্লেখিত তথ্য থেকেই বুঝা যায়। তবু আরো একটি যুদ্ধাপরাধের তথ্য দেই। বিবিসি নিউজের[৫] ১৯ নভেম্বর ২০২০ এর তথ্য মতে আফগানিস্তানে মোতায়েন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য কর্তৃক কোন কারণ ছাড়াই ৩৯ জন নিরস্ত্র আফগান নাগরিককে হত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেখানে সৈন্যরা যুদ্ধরত ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। অর্থাৎ এগুলো ঠাণ্ডা মাথার খুন ছিলো। মার্কিন এবং ন্যাটো সৈন্যদের দ্বারা এরকম শত সহস্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন লাখো নিরীহ-নিরস্ত্র আফগান। শুধু আফগানিস্তানে নয় নিজেদের দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতে নিত্যকার ঘটনা। কৃষ্ণাঙ্গ রেড-ইন্ডিয়ানদের রক্তের উপর দাঁড়ানো আমেরিকা আজো পারেনি বর্ণবাদের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত হতে। তাই আমরা জর্জ ফ্লয়েড এর মত শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে আমেরিকান পুলিশের হাটুর নিচে 'আমি শ্বাস নিতে পারছি না' বলে ধুকে ধুকে মরতে দেখি। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক কাশ্মিরকে পৃথিবীর বৃহত্তম জিন্দানখানায় রূপদান, বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে মন্দির নির্মাণ, সংখ্যালঘু মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন ও গোরক্ষার নামে মানুষ হত্যার ইতিহাস সবারই জানা।

উপরে উল্লেখ করা প্রায় সবগুলো রেফারেন্সই পশ্চিমা মিডিয়া থেকে নেওয়া যারা আসলে আফগান যুদ্ধের একটি পক্ষ। যখন যুদ্ধরত একটা বাহিনীর নিজেদের মিডিয়া মানবাধিকার, নারী অধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের কথা স্বীকার করে খবর ছাপায় তখন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা কতটা ভয়াবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। গত বিশ বছরে মানবাধিকারের এসব সুস্পষ্ট লঙ্ঘন দেখেও সবাই চুপ ছিলো। চুপ ছিল বললে ভুল হবে, সবাই সরব ছিল আফগানিস্তানের মাটির সন্তান তালেবানকে সন্ত্রাসী অর্থে জঙ্গি আখ্যা দিতে। এতো কিছুর পরও যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী এবং আফগান জনগণের সমর্থনহীন পুতুল সরকারের পতন নিশ্চিত দেখে এখন ভবিষ্যৎ আফগানিস্তানে মানবাধিকার আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার ভান করা চূড়ান্ত সীমার ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

সবশেষে আলোচনা করব তালেবানের আয়ের উৎস নিয়ে। অনেকে দাবি করেন গত বিশ বছরে এরকম একটি পরাশক্তির বিপক্ষে প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকতে আফিম ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় তালেবানকে অনেক বেশি সহায়তা করে। এখন তারা সন্দেহ করছেন আফিম ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত তালেবান রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে আফগানিস্তানে মাদক ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে পারে। তালেবান মাদক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এ দাবি যুদ্ধরত এক পক্ষ তথা পশ্চিমাদের। তা আদৌ সত্য কি না এ প্রশ্নের অবকাশ রাখে। প্রয়াত অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমানের দেওয়া তথ্য মতে-তালেবানের মাত্র পাঁচ বছরের (১৯৯৬-২০০১) শাসনামলে আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল ৭৫ শতাংশ।[৬] যারা শাসনক্ষমতায় থাকাবস্থায় এমন দ্রুত আফিম চাষ হ্রাস করেছে তারা পরে মাদক ব্যবসা করেছে, তারা আবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলে আফিমের ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে এ দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু তালেবান ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছে তারা সব রকমের মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করবে।

আমরা জানি আফগান যুদ্ধে হেরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রিলিয়ন ডলার আর ভারতের বিলিয়ন ডলার গচ্ছা গেছে। তালেবানের প্রতি তাদের প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানোর চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। তাদের জন্য খারাপ লাগে যে গত বিশ বছরেও তারা প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানোর জন্য তালেবানের এমন এমন কোন দুর্বলতা খোঁজে বের করতে পারেনি যেগুলোতে তারা নিজেরা অন্তত শক্তিশালী। যদি বের করতে পারত তবে নারী অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আবার মিডিয়া গরম করত না যেগুলোতে তাদের নিজেদের অবস্থাই তথৈবচ। মোট কথা, পরাজিত শক্তির প্রোপাগাণ্ডা সম্পর্কে সবারই সচেতন হওয়া উচিত। বিশেষ করে মুসলমানদের এসব ফাঁকা বুলি সম্পর্কে একটু বেশিই সচেতন হওয়া উচিত। সবশেষে প্রত্যাশা এটাই-তালেবানের মাঝে আগের তুলনায় আরো বেশি সহনশীলতা আসুক, তারা দেশের সকল জনগনকে গুরুত্ব দিক, আফগানিস্তানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক। আরো প্রত্যাশা, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের পতন হোক, আমাদের মত উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে ডলার খেকো বুদ্ধিজীবী এবং মিডিয়ার পতন হোক।

তালেবানের দখল পরবর্তী কাবুল বিমানবন্দরের দৃশ্যচিত্র থেকে একটা শিক্ষণীয় বার্তা উল্লেখ করে শেষ করছি- পালানোর রাস্তা নিশ্চিত না করে দেশি ও বিদেশি শক্তির মধ্যে বিবাদে বিদেশি শক্তির তাবেদারি করা অত্যন্ত বোকামি। যদি বিদেশি শক্তি পরাজিত হয় তবে তারা কোন না কোন ভাবে পালিয়ে যাবেই, মাঝখান দিয়ে আপনার তাবেদারির স্মৃতি আপনাকে এতোটা ভীত করবে যে বিমানের পাখায় চড়ে হলেও দেশ থেকে পালাতে আপনি উদ্যোগী হবেন।

১. Al jazeera, Injustice In the Age of Obama
২. New york Times (Online), 'This Is Unacceptable.' Military Reports a surge of Sexual Assaults in the Rank
৩. Reuters (Online), Exclusive: India Most Dangerous Country for Woman
৪. The Guardian (Online), US Soldiers killed Afghan Civilians for Sport
৫. BBC News (Online), Australian 'War Crimes': Ellit Troops Killed Afghan Civilians
৬. বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর, পৃষ্ঠা-২১৩

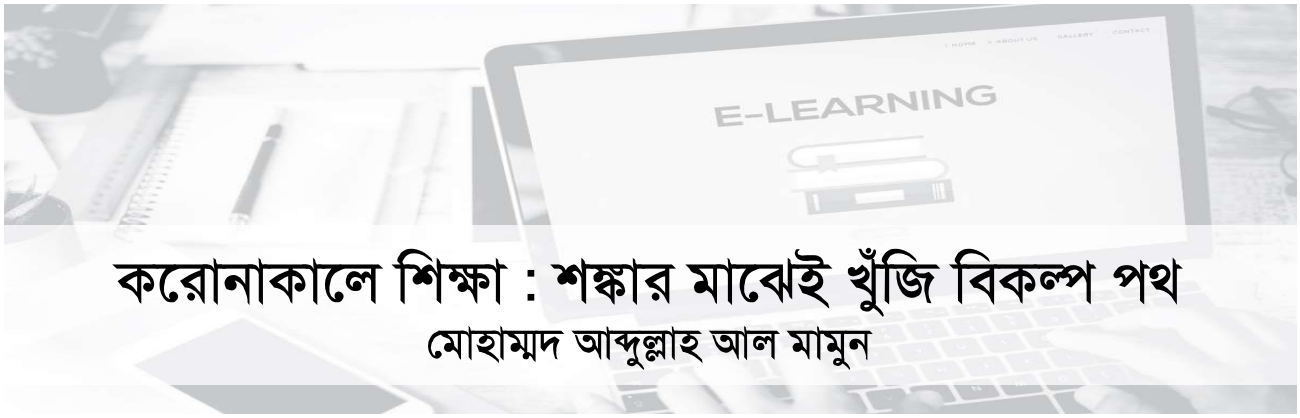

করোনাকালে শিক্ষা : শঙ্কার মাঝেই খুঁজি বিকল্প পথ

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

কেস স্টাডি-১: লিটন আহমদ স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল ২০১৯ সালে। করোনা শুরু হলে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে পড়ালেখায় মন বসে না। তাই গাড়ি চালানো শিখে। সে একটি প্রাইভেট কোম্পানীর গাড়ি চালাচ্ছে এক বছর ধরে। রোজগার করছে এখন। তার ছোট বোন মিনা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তারও বিয়ে হয়েছে গত বছরের মাঝামাঝি। শ্বশুর বাড়ির লোকদের ইচ্ছে নেই মিনা আর পড়ালেখা করুক।

কেস স্টাডি-২: আদিল সিলেটের একটি নামকরা স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। করোনার শুরুর দিকে অনলাইনে ক্লাস করার জন্য তার হাতে স্মার্ট ফোন তুলে দেন মা-বাবা। প্রথম কয়েক মাস ভালোই মনোযোগী ছিল অনলাইন ক্লাসে। এরপর আস্তে আস্তে মোবাইলে গেম খেলাসহ নানা অ্যাপসে আসক্ত হয়ে পড়ে সে। তার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি সরিয়ে নিলে সে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কেস স্টাডি-৩: মেহের স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। করোনা শুরুর সাথে সাথেই কর্তৃপক্ষ তার এবং তার সহকর্মীদের সম্মানী বন্ধ করে দেন। নিয়মিত ভাড়া দিতে না পারায় ভাড়া বাড়িতে চালু থাকা স্কুলটিই চলতি বছরের শুরুতে বন্ধ করতে বাধ্য হন উদ্যোক্তারা।

উপরের ঘটনাগুলোর মতো নানামুখী সঙ্কটে এখন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষক,শিক্ষার্থী,অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের লোকজন রয়েছেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে। ঝরে পড়া,যন্ত্রে আসক্তি, পরীক্ষা না থাকা, অটো পাস, সেশন জট, শিখা পড়া ভুলে যাওয়া, নতুন পড়া না শিখা, একাকিত্ব, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি আজ গিলে খাচ্ছে আমাদের শিক্ষাকে। কেউ কেউ বলছেন করোনাকালে স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতো, না গিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে রয়েছে তারা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে খুলবে? তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই এখন একমাত্র বিকল্প হচ্ছে অনলাইন ক্লাস ও অ্যাসাইনমেন্ট। আর্থিক অসঙ্গতি, নেটওয়ার্ক সমস্যা, গতানুগতিক ক্লাস গ্রহণসহ নানা কারণে অনলাইন ক্লাসের সাথে এখনো যুক্ত হতে পারেনি শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ। অ্যাসাইনমেন্টের পক্ষে বিপক্ষেও রয়েছে যুক্তি পাল্টা যুক্তি। সৃজনশীলতার পরিবর্তে অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীদের নকল প্রবণতা ও চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহিত করবে। তাছাড়া অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ ও জমাদানে স্বাস্থ্যঝুঁকিও থেকে যায়।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা না নিয়ে পরীক্ষার ফল ও সনদ দিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আমরা কি কেউ কোনো দিন কল্পনা করেছিলাম? তাও আবার ১০০% উত্তীর্ণ। কোনো পরীক্ষায় কি কখনো শতভাগ উত্তীর্ণ হয়? তাও আমাদের দেখতে হলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটানা বছরের পর বছর বন্ধ থাকবে সেটা তো আমাদের স্বপ্নেও ছিল না। ক্লাসের সবচেয়ে ফাঁকিবাজ,সবচেয়ে বেশি স্কুল কামাই করা শিক্ষার্থীরাও আজ সহপাঠির সান্নিধ্য খুঁজে মনের জানালায়। অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের 'মনের ঘরে' করোনার প্রভাব থাকলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কিন্ত ঘরে বসে নেই। তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাজারে যাচ্ছে। যাচ্ছে অনুষ্ঠানাদিতেও। স্বাস্থ্যবিধিও মানছে না অনেকেই।

তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের যা যা করা খুব প্রয়োজন-

১. ব্লেন্ডিং পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া। যখন সংক্রমনের হার কমবে বা নিয়ন্ত্রণে থাকবে তখন কিংবা যে অঞ্চলে সংক্রমন কম থাকবে সেখানে স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়া।

২. বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ,স্মার্ট ফোন ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা এবং এর অপব্যবহার রোধে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩. স্বাস্থ্যবিধি মানার সব উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

৪. সঠিকভাবে কার্যকর অনলাইন ক্লাস গ্রহণের জন্য দেশের সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

৫. অনলাইন শিক্ষায় বিনোদন যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৬. যে সব শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা।

৭. সরকারিভাবে রেডিও টিভিতে দৈনিক প্রচারিত ক্লাস গ্রহণ নিশ্চিত করতে অভিভাবক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

৮. সরকারি ঘোষণা বাস্তবায়নে দ্রুত শিক্ষা টিভি চালু করা।

৯. শিক্ষায় বরাদ্ধ বাড়ানো। দেশের সব কিন্ডারগার্টেন শিক্ষককেও প্রণোদনার আওতায় নিয়ে আসা।

১০. গরীব শিক্ষার্থীদের পরিবারে খাবারের ব্যবস্থা করা।

১১. অনলাইন ক্লাসের কার্যকারিতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে সরাসরি স্মার্ট ফোন না দিয়ে অভিভাবকদের মাধ্যমে প্রতিদিনের পড়ালেখার বিষয় ও সর্বশেষ তথ্য নিশ্চিত করা।

১৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমাতে অনলাইনেই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ।

১৪. সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিকল্প পথ অবশ্যই ভাবা উচিত। প্রয়োজনে এক ক্লাস সপ্তাহে একদিন হিসেবে প্রাথমিকভাবে খুলে দেওয়া।

১৫. গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সুবিধা বিস্তৃত করা। যাতে অনলাইন ক্লাস গ্রহণে গ্রাম-শহরের বৈষম্য কমে আসে।

১৬. শিক্ষক,শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকার আওতায় নিয়ে আসা।

করোনা একেবারে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে এমনটা ভাবছেন না বিশেষজ্ঞরা। অন্যান্য মহামারির মতো করোনাও এক সময় হয়তো নিয়ন্ত্রণে আসবে। দীর্ঘশ্বাসবিহীন পৃথিবীতে আবারো নতুন করে মাথা উঁচু করে চলতে হলে শিক্ষা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে এখনই।

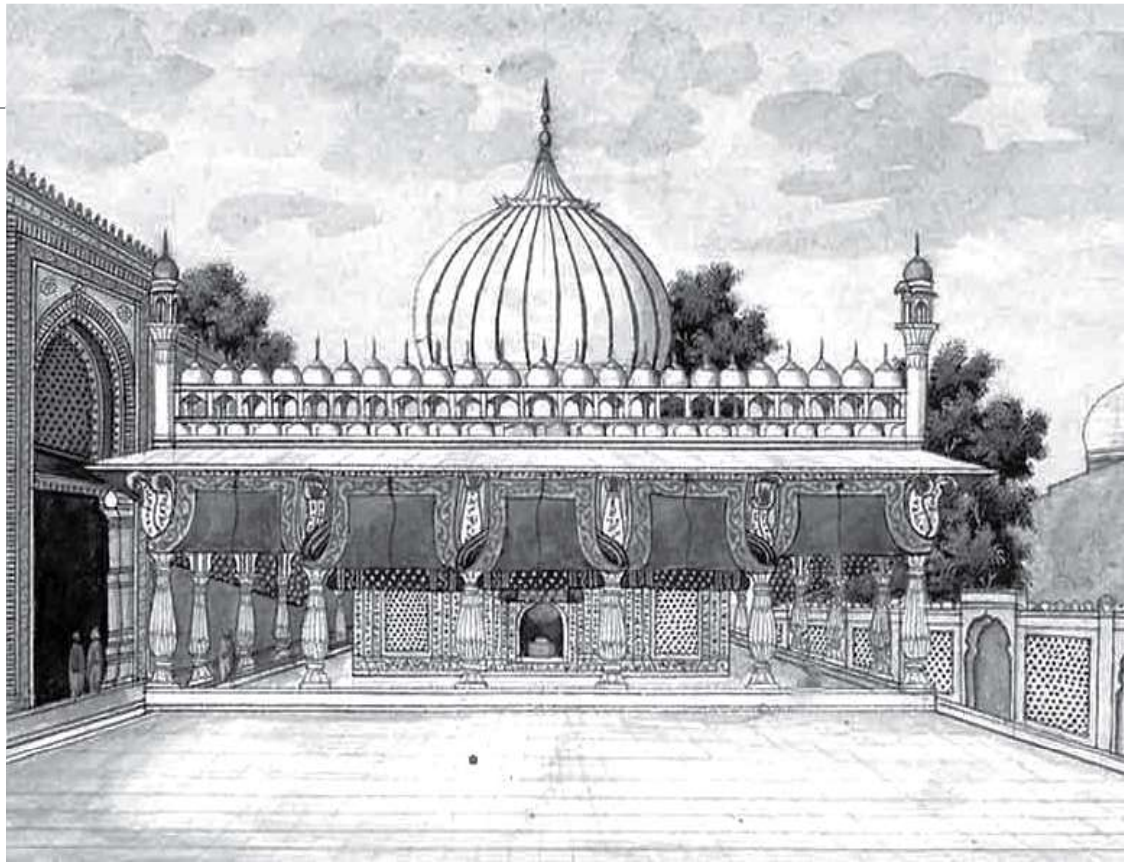

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

ভারত সফরে কয়েকদিন

রুহুল আমীন খান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মোর মাঝে, বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

নয়াদিল্লীকে দেখে, পুরান দিল্লীর পথে পথে হেঁটে বারবার বিশ্বকবির সুবিখ্যাত কবিতার এই চরণ ক'টি মনে পড়েছিল। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এই নগরী। কত বিজয়ী বীরের দর্পিত পদভারে কম্পিত হয়েছে, কত আগ্রাসী শক্তির নিষ্ঠুর আক্রমনে বিক্ষত হয়েছে এই দিল্লী। কত রণ দামামা, কত বিজয়ী নাকারা হেথায় আকাশ-বাতাস করেছে আলোড়িত, আন্দোলিত। কত সম্পদে হয়েছে সমৃদ্ধ, কত লুন্ঠনে হয়েছে রিক্ত, কত আনন্দে, গৌরবে হয়েছে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত, কত পুলকে হয়েছে প্লাবিত, কত বেদনায় হয়েছে বিষাদিত এই দিল্লী তার সঠিক হিসাব অসম্ভব হলেও কালের গর্ভে একেবারে বিলিন হয়ে যায়নি সে সবের স্মৃতি চিহ্ন। তা ছড়িয়ে আছে দিল্লীর-আগ্রার এখানে সেখানে। তারা যেন নিঃশব্দে ডেকে বলছে 'দাঁড়াও পথিক হেথা তিষ্ট ক্ষণকাল'। কিন্তু 'দাঁড়াবার সময় যে নাই'। সময়স্বল্প, প্রোগ্রাম ঠাসবুনানো। তবু যেতে যেতে দেখলাম যতটা সম্ভব। যতটা সাধ্যে কুলোয়। মনে পড়ে একবার আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে বেরিয়েছিলাম শহর দেখতে। গাড়ীর ড্রাইভার ছিল মোম্বাইয়ের। বললাম, ভালো করে দেখিও যা কিছু আছে। লোকটি শিক্ষিত। চাকরি করে বাংলাদেশ দূতাবাসে। আমরা রাষ্ট্রদূতের মেহমান। বেরিয়ে পড়ল আমাদের নিয়ে। ঘুরল কিছুক্ষণ এ রাস্তায় ও রাস্তায়। অবশেষ সাগর সৈকতের অট্টালিকা শোভিত এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, তাতেই হয়ে যাবে। সমঝদার লোকদের জন্য আসলে দেখার কিছু নেই আবুধাবী, দুবাই কিংবা দোহায়। মরুভূমির দেশ। ছিল বালুর সমুদ্র। আল্লাহ মাটির নিচে ঢেলে দিয়েছেন তেল। তার রয়ালটি পেয়ে হয়ে গেছে মহাধনী। বানিয়েছে আকাশ ছোঁয়া সব বাড়ী। বানিয়েছে তেলতেলে কুচকুচে মসৃণ প্রশস্ত সব রাস্তা। যেখানে যাবেন সেখানে একই দৃশ্য। এর ভবনে ভবনে ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই। শহর দেখবেন তো কায়রো, দামেস্কা, বোম্বো, দিল্লী, আগ্রা যান। কথাটা বড় কঠিন সত্য বলে মনে হল।

সেই দিল্লীতেই কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে বেরিয়েছি আমরা। যেখানেই যাচ্ছি আশপাশে দেখতে পাচ্ছি ফেলে আসা ইতিহাসের নীরব সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে। কেউবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারও বা গায়ের ছাল-বাকল উঠে গিয়ে হয়েছে বিবর্ণ। কারও বা দারুন বেহাল দশা। অনেকে আবার এখন পর্যন্ত কালের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে মোটামুটি বহাল তবিয়তে

বিদ্যমান। পুরাকীর্তিতে মুসলিম স্থাপত্যরীতি সুস্পষ্ট। থাম, গম্বুজ, মিনার, আর্চ, পাথরের জালি, অগ্রভাগের সুক্ষ্মতা নিয়ে ঘোষণা করছে সাতন্ত্র্য, স্বকীয় মহিমা। মুসলিম শাষনকাল, তার পূর্ববর্তীকাল ও পরবর্তীকাল- এ তিনকালের পার্থক্য শুধু শরীরে, মুখাবয়বে নয়, ভেতরে, বাইরে, দেহের পরতে পরতে- সর্বত্র বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসনামলে এসে মিশ্রন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতির সাথে মেলানো হয়েছে গ্রীক ধারা, গ্রহণ করা হয়েছে মুসলিম স্থাপত্যরীতিরও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি। আসলে ভারতের এ অঞ্চল এবং অনুরূপ আবহাওয়া বিশিষ্ট দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল স্থাপত্যের স্থায়িত্বের জন্য খুবই অনুকূল। আমাদের বাংলাদেশের মতো বাতাসে নেই আদ্রতা, লবণাক্ততা। নেই নদী ভঙ্গন। আকাশে নেই মেঘের ঘনঘটা। রৌদ্র নির্মল। সুতরাং স্থাপত্যের স্থায়িত্বের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী এই ভূমি। তুর্করা এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের থেকে, সাথে নিয়ে এসেছে সমরখান্দ-বোখারসহ সেমিটিক দক্ষ কারিগরদের। স্মৃতিকে করতে চেয়েছে অমর। এজন্য অকাতরে ঢেলেছে অর্থ। রুচি, ঐশ্বর্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য মিলে স্থাপত্যে সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী স্বকীয়তা, নান্দনিকতা। শুধু বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়, বস্তুর উর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি অগোচরে যে অব্যক্ত অনির্বচনীয় আর এক রূপের জগৎ আছে, সেই জগতে দশককে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে দিল্লী-আগ্রারা অনেক কালোত্তীর্ণ শিল্পের স্থাপত্যের অতীতের দিল্লী আকর্ষণীয় যেমন ঐতিহ্যে, তেমনি হালের নয়াদিল্লীকে আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তার উদ্যানে। রাস্তাগুলো ঋজু, প্রশস্ত, ছায়াচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে তার মসৃণ পিচের আস্তরণ। ইদানিং গড়ে উঠেছে ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার। তার এ পাশে ও পাশে সবুজের মেলা। বৃক্ষ আর বৃক্ষ গোটা এলাকাকেই মনে হয় যেন আস্ত একটা পার্ক। ইমারতের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে উদ্যান। স্নিগ্ধ শ্যামলতার আমেজ। যতটা সম্ভব অবলোকন করলাম সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য।

এবার যাত্রা নিযামুদ্দীনের দিকে। অনেকটা পথ পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম এই জগৎ বিখ্যাত ওলীয়ে কামিলের মাযার যিয়ারতে। তিনি শুধু আধ্যাত্মিক জগতের অতি উচ্চ মার্গের সাধক পুরুষই ছিলেন না, ছিলেন- হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, আরবী ভাষা সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র এমন কী প্রকৌশল বিদ্যায়ও পারদর্শী এক মহামনীষী। ছিলেন- আড়ম্বর, খ্যাতি, অর্থবিত্তের প্রতি অনীহ, নির্মোহ, নিরাসক্ত দুনিয়াদারীর সাথে সংশ্রবহীন মহাসাধক। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়, উদারতা, মানবতা প্রসারে, জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি স্থাপনে তার অবদান অবিস্মরণীয়। দিল্লীর বেশ ক'জন সম্রাট, সুলতানের শাসনামল তিনি পেয়েছেন নিজের আদর্শে-নীতিতে অটল-অবিচল। ফকীরের ঝুপড়ির কাছে হার মেনেছে রাজ সিংহাসন। দরবেশের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে রাজকীয় ক্ষমতা-দাপট। চূর্ণ হয়েছে দম্ভ অহংকার। তিনি যে জগতের সম্রাট, দুনিয়ার সম্রাটের ক্ষমতা সেখানে তুচ্ছ। বারবারই তা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষি হয়ে আছে। সে কথায় আসছি একটু পরে। তাঁর আগে তাঁর জীবনী সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করে নিই। তার আসল নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ। জন্ম বাদাউনে ১২৩৮ ঈসায়ী সালে। প্রাথমিক বিদ্যা থেকে শুরু করে যাহিরী ইলমের সকল শাখার প্রগাঢ় পান্ডিত্য অর্জন করেন ২০ বছর বয়সের মধ্যে। এরপর আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইলমে মারিফত হাসিল করার জন্য বাইআত গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশাকর (র.) এর হাতে। ১২৬০ সালে মুর্শিদ তাঁকে দান করেন খিলাফত এবং 'নিযামুদ্দীন মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন' খেতাব। সেই থেকে তিনি মশহুর হন নিযামুদ্দীন আউলিয়া নামে। তিনি আস্তানা স্থাপন করেন শহরের অদূরে যমুনা নদীর তীরে গিয়াসপুর নামের নিভৃত পল্লীতে। তিনি বাস করতেন ঘাস ও খড় নির্মিত একটি ঝুপড়িতে। সুলতান জালালুদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৫) হযরত নিযামুদ্দীনকে একটি গ্রাম জায়গীর হিসেবে দিতে চান কিন্তু তা তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে সুলতান নিজেই তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাও তিনি অস্বীকার করেন। এরপর সুলতান পুত্র খিযীর খান যিনি পীর ছাহেবের মুরিদ ছিলেন তার মারফত দুআ চান ওরাংগিল বিজয়ের জন্য। দরবেশ দুআ করেন এবং অচিরেই এই এলাকা সুলতানের হস্তগত হয়। পরবর্তীতে সুলতান কুতুবুদ্দীন খলজী (১৩০৬-১৩২০) হযরত নিযামুদ্দীনের অপ্রতিহত প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে বষীভূত করার নানা ফন্দি আঁটেন। তিনি প্রতি চাঁদনী রাতে সকল উলামা-মাশায়িখকে শাহী দরবারে হাযির হওয়ার ফরমান জারী করেন। এতদসত্ত্বেও শাইখ সেখানে হাযির না হওয়ায় সুলতান জোরপুর্বক তাকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু তারা দরবেশের আস্তানায় পৌঁছার পূর্বেই সুলতান নিজ গোলামের হাতে নিহত হন । পীর ছাহেবের দরবারে হাদিয়া তুহফা আসতো প্রচুর। কিন্তু তিনি সঞ্চিত করতেন না কিছুতেই। অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর দরবারে লঙ্গরখানায় প্রত্যহ এক হাজার আলিম দু'শ কাওয়াল আহার করতেন। তিনি নিজে বছরের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন। তিনি তাঁর মুরিদদের ইলমে শরীআত অর্জনে বিশেষ তাগীদ দিতেন। তিনি বলতেন, একজন সুফীর জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক।

গরীব নেওয়াজ খাযা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর তরীকা উপমহাদেশের দিকে দিকে পৌঁছিয়ে দেন হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.)। তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়। তিনি তাঁর খলীফা সিরাজুদ্দীন আখি সিরাজকে ইসলাম প্রচারের জন্য হুকুম দেন বঙ্গদেশে। মাওলানা বুরহানুদ্দীনকে নিযুক্ত করেন দাক্ষিণাত্যে। শাইখ ইয়াকুবকে পাঠান গুজরাটে, মালওয়াহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুগীছুদ্দীনকে। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের দিকে দিকে শুধু ইসলাম প্রচারই হয়নি মুসলিম বিজয়ের পথও হয়েছে প্রশস্ত।

দিল্লী হনুজ দুরঅস্ত-দিল্লী বহুদূর

'দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত' এই বিখ্যাত প্রবাদটি সৃষ্টি হয়েছে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার একটি উক্তি থেকে। ঘটনাটি পাঠান সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের (১৩২০-১৩২৫) সাথে সম্পৃক্ত। প্রখ্যাত লেখক যাযাবর তাঁর দৃষ্টিপাতে এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া দিল্লীর অদূরে আস্তানা স্থাপন করেছেন, ক্রমে প্রচারিত হলো তাঁর সুখ্যাতি। অনুরাগী সংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুতবেগে। স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি। সেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধুরা ভরবে ঘট এবং নামাযের পূর্বে প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারীর দল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে। উদ্দীপ্ত হলো রাজকোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকীর নিযামুদ্দীন আউলিয়া। গিয়াসুদ্দীনের

দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, রাজ্য শাসনের দক্ষতা ছিল। ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তার আনুসঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুন্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দীন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন করলেন নতুন নগর, তৈরী করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরদ্বারে দুর্জয় দূর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত আর একদিকে প্রাচীরবেষ্ঠিত নগরী মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈল শিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই জলাশয়ে। সংবৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের। ফকীর এবং সুলতানের সংঘর্ষ ঘটলো এই নগরনির্মাণ কিংবা আরো কঠিনভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ করেই।

নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দীঘি কাটতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দীনের নগর প্রাচীর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত; দু'জায়গায় প্রয়োজন মেঠানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে বাদশাহ চাইবেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তার কাজ,ততক্ষণ অপেক্ষা করুক ফকীরের খয়রাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের সেটা পরিমাণ করা যায়। ফকীরের জোর হৃদয়ে তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিযামুদ্দীনের তালাও। সুলতান হুংকার ছেড়ে বললেন, তবে রে-

কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলবার আগেই এত্তেলা এলো আশু কর্তব্যের। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য সমস্ত নিয়ে। শাহজাদা মুহাম্মদ তুঘলক রইলেন রাজধানীতে রাজ প্রতিভূরূপে। তিনি নিযামুদ্দীনের অনুরাগীদের অন্যতম। তার আনুকূল্যে দিবা-রাত্রী খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অবিলম্বে। তুঘলকাবাদের নগর প্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গুনলেন নিযামুদ্দীনের অনুরাগীরা। তারা ফকীরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকীর মৃদুহাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন 'দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত' দিল্লী অনেক দূর, বলে।

প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট থেকে নিকটতম হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুনয় করে ফকীরকে। প্রত্যহই একই উত্তর দেন নিযামুদ্দীন-দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমনের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিস্য প্রশিস্যেরা অনুনয় করলো সন্যাসীকে,এখনও সময় আছে এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দীনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিলনা কারো কাছে। ফকীরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তার সেকথা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠল বারংবার। স্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন, বিগত ভয় সর্বত্যাগী সন্যাসী-'দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত'। দিল্লী এখনও অনেক দূর বলে, হাতের জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

নগর প্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মুহাম্মদ তৈরী করেছে মহার্ঘ্য মন্ডপ। কিংখাবের সামিয়ানা জরিতে, জহরতে ঝলমল।

বাদ্যভাণ্ড, লোক-লস্করে, আমীর-উমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তিযুখের প্রদর্শন প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তার উত্তরাধীকারীর। পরদিন গোধূলী বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মন্ডপে। প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মুহাম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনান্তে অতিবিনয়াবনত কণ্ঠে মুহাম্মদ অনুমতি প্রার্থনা করলেন সম্রাটের। জাঁহাপনার হুকুম হলে এবার হাতির কুচকাওয়াজ শুরু হয়, হস্তিযুখ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দীন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে। মুহাম্মদ মণ্ডপ থেকে নিক্রান্ত হলেন ধীর শান্ত পদক্ষেপে- করকর কর করাৎ । একটি হাতির শির সঞ্চালনে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ।

মুহূর্ত মধ্যে সশব্দে ভূপাতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের থাম। চাপা পড়া মানুষের আর্তকন্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রীর আকাশ। ধুলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্তত ধাবমান হস্তিযুথের গুরুভার-পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং সে বিভ্রান্তকারী বিশৃংখলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করল বাদশাহের । পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ভগ্নস্তূপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি মনোনীত করছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধকরি আপন দেহের বর্মে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তার স্নেহাস্পদকে।

সমস্ত ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপুত্র গিয়াসুদ্দীনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগর প্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তার পদক্ষেপের অতীত। দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত-দিল্লী অনেক দূর। দূরই রয়ে গেল।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.) ইন্তিকাল করেন ১৮ রবিউস সানী, ৭২৫ হিজরী মুতাবেক এপ্রিল, ১৩২৫ সালের জুমুআহর দিন ভোরবেলা। তিনি ৭ মাস ধরে ছিলেন রোগে শয্যাশায়ী। খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুর ৪০ দিন আগে থেকে এবং নিমজ্জিত হয়েছিলেন গভীর আত্মনিমগ্ন অবস্থায়। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি খাদিমকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, ঘরে যা কিছু আছে গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। ওসীয়ত মুতাবেক জঙ্গলেই তাকে দাফন করা হলো। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক (১৩২৪-১৩৫১) তার মাযারের উপরে নির্মাণ করে দেন এক আলিশান গম্বুজ, যা আজও বিদ্যমান।

চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকে এখানে যিয়ারতকারীদের ভিড়। লোকসমাগমের তুলনায় মাযার পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুবই অপ্রশস্ত। এর সম্প্রসারণ প্রয়োজন। পথের দু'ধারে অধিকাংশ আতর গোলাব, মোমবাতি-আগরবাতি আর ফুলের দোকান। মণকে মণ, টনকে টন গোলাপ পাঁপড়ী। ভক্তেরা নিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে মাযারে, মাযারের চার ধারে। চলছে কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, মুনাজাত। রূহানীয়াতের সম্রাট শুয়ে আছেন, দরবার তার জমজমাট। দিল্লীর এখানে-সেখানে শুয়ে আছেন অনেক রাজা-বাদশা। জীবনাবসানের সাথে সাথে তাদের ক্ষমতা, প্রতাপ সকলেরই হয়েছে অবসান। কিন্তু রূহানীয়াতের সম্রাটদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাব প্রতাপতো শেষ হয়ই না বরং বাড়তে থাকে দিনে দিনে। উভয় সম্রাটের পার্থক্য এখানেই।

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

ধর্মীয় বিদ্বেষ ও টেরাচোখ ছাত্র

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

দার্শনিক ও সাধক কবি মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফের অসংখ্য মনোজ্ঞ গল্পের মাঝে একটির নাম ধর্মান্ধ বাদশাহর খ্রিস্টান নিধনযজ্ঞ। প্রাচীন যুগে এই যালিম বাদশাহর মাথায় ছিল ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা। যে কারণে সে খ্রিস্টানদের ওপর নিধনযজ্ঞ চালাত। বাদশাহ ছিল ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী। ইয়াহুদী ধর্মের নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ.) আর খ্রিস্টানদের নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর অনুসারী বলে দাবিদার ইয়াহুদী বাদশাহর মনে মগজে বাসা বেঁধেছিল চরম সাম্প্রদায়িকতা। তাই সে ঈসার (আ.) অনুসারী খ্রিস্টানদের শত্রু বলে ভাবত ও হত্যা করত। মাওলানা রূমীর মতে এই বাদশাহ আসলে টেরাচোখ ছিল। ধর্মান্ধতা,স্বার্থপরতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তাকে টেরাচোখে পরিণত করেছিল। আল্লাহর নবী মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) যে এক এবং তাদের ধর্ম অভিন্ন, সে সত্যটি সে দেখতে পেত না; বরং এক আল্লাহর নির্দেশিত অভিন্ন ধর্মকে দুই ও পরস্পর পৃথক বলে মনে করত। সেই ধারণা থেকেই খ্রিস্টান নিধনযজ্ঞ চালাত।

মাওলানা রূমী এ ধর্মান্ধ ইয়াহুদী বাদশাহর স্বরূপ ব্যক্ত করার জন্য একটি চমৎকার গল্পের অবতারণা করেছেন।

شاه احول کرد در راه خدا

آن دو دمساز خدایی را جدا

শা'হ্ আহ্ওয়াল কার্দ দার রা'হে খোদা'

অ'ন দো দামসা'যে খোদা'য়ী রা' জুদা'

টেরাচোখ বাদশাহ আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত
আল্লাহর এই দুই বন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

যাদের চোখ টেরা তারা একটি জিনিসকে দুটি বলে মনে করে। ইয়াহুদী বাদশাহও বিদ্বেষ-দুষ্টতার কারণে টেরাচোখ বনে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহর পথে নিবেদিত দু'জন নবীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখেছিল; যদিও তাঁরা এক ও অভিন্ন পথের দিশারী ছিলেন। আসলে টেরাচোখ লোকদের স্বভাব এটাই। টেরাচোখের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মাওলানা বলেন,

گفت استاد احولی را کاندر آ

رو برون آر از وثاق آن شیشه را

গোফ্ত্ উস্তা'দ আহওলী রা' কান্দার আ'
রও, বুরূন আ'র আয বেসা'ক্ব আ'ন শীশে রা'
উস্তাদ বলল টেরা চোখ ছাত্রকে, ভেতরে যাও
কামরার মাঝখান থেকে বোতলটি এনে দাও।

گفت احول زان دو شیشه من کدام

پیش تو آرم بکن شرح تمام

গোফ্ত্ আহওয়াল যা'ন দো শীশে মন কোদা'ম
পীশে তো আ'রম বকুন শারহে তামা'ম
টেরা চোখ বললেন, দুই বোতলের মধ্যে কোনটি
আপনার কাছে আনব হুযুর, খুলে বলুন সেটি।

گفت استاد آن دو شیشه نیست رو

احولی بگذار و افسزون بین مشو

গোফ্ত্ উস্তা'দ অ'ন দো শীশে নীস্ত, রো
আহ্ওয়ালী বোগযা'র ও আফযুন বীন মাশো
উস্তাদ বলেন, বোতল দু'টি নয়, যাও গিয়ে দেখ
তোমার টেরাপনা অতিরিক্ত দেখার অভ্যাস ছাড়।

گفت ای استا مرا طعنه مزن

گفت استا زان دو یک را در شکن

গোফত্ এই উস্তা' মারা' তা-নে মাযান্
গোফ্ত্ উস্তা' যা'ন দো য়্যক রা' দার শেকান
বলল, উস্তাদজি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না ফাও
উস্তাদ বলেন, তাহলে দু'টোর একটা তুমি ভেঙ্গে দাও।

শাগরেদ বলে, হুযুর দয়া করে আমাকে হাসি ঠাট্টার পাত্র বানাবেন না। এখানে বোতল একটি নয়, দু'টি। উস্তাদ বিরক্ত হয়ে বললেন, তাহলে একটা বোতল ভেঙ্গে ফেলে দাও। বাকিটা নিয়ে এসো আমার কাছে।

شیشه یک بود و به چشمش دو نمود

چون شکست او شیشه را دیگر نبود

শীশে য়্যক বূদ ও বে চাশ্মাশ্ দো নামূদ
চোন শেকাস্ত উ শীশেরা' দীগার নাবূদ
বোতল একটিই ছিল, তার চোখে দুই দেখাচ্ছিল
যখন ওটা ভাঙল, দ্বিতীয়টাও অদৃশ্য হল।

چون یک بشکست هر دو شد ز چشم

مرد احول گردد از میلان و خشم

চোন য়্যকী বেশকাস্ত, হার দো শূদ যে চাশ্ম্
মর্দ আহওয়াল গার্দাদ আয্ মায়লা'ন ও খাশ্ম্
একটি যখন ভাঙল তখন দু'টিই দৃষ্টির আড়াল হল
আসক্তি ও শত্রুতায় যে কেউ টেরাচোখ হয়ে যায়।

এক ওস্তাদ তার এক টেরাচোখ ছাত্রকে বললেন, ভেতরের কামরায় একটি বোতল আছে। যাও গিয়ে বোতলটি নিয়ে এসো। ছাত্রটি ভেতরে গিয়ে বলে, ওস্তাদ! বোতল তো দু'টি। কোনটি নিয়ে আসব। ওস্তাদ বললেন, বোতল তো একটি। তুমি দু'টি কোথায় পেলে? সবকিছু দু'টি দেখার টেরাপনা ছাড়। ছাত্র বলল: হুজুর! খামাখা আমার বদনাম করছেন। এসব গালি আর শুনতে মন চায় না। এখানে বোতল দু'টি। ওস্তাদ রাগত:স্বরে বললেন, বোতল দু'টি হলে, যাও একটি ভেঙ্গে ফেল, অপরটি নিয়ে এসো। ওস্তাদের কথা মতো ছাত্র একটি বোতল ভেঙ্গে ফেলল। কিন্তু সাথে সাথে অপর বোতলটিও উধাও হয়ে গেল। এই ছোট্ট গল্প দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের পর মাওলানা বলছেন, আসলে দু'টি কারণে মানুষ টেরাচোখ হয়ে যায়। এর একটি হচ্ছে ক্রোধ, দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির কামনা। এই দু'টি থেকে উৎপত্তি হয় স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব, হিংসা, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁয়ার্তুমী ইত্যাদি। অন্যকথায়, মানুষ যখন কাম ও ক্রোধে আক্রান্ত হয়, তখন তার বাতেনী চক্ষু আক্রান্ত হয়। বাস্তবতাকে স্বরূপে দেখতে পায় না। কাম ক্রোধের পর্দা এসে তার চোখ টেরা করে দেয়। ফলে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ বাছ-বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মাওলানা মানব জাতিকে কাম ও ক্রোধের অনিষ্টতা হতে সতর্ক করেছেন এই গল্পের সাহায্যে। তিনি বলছেন,

خشم و شهوت مرد را احول کند

زاستقامت روح را مبدل کند.

"খাশ্‌মো শাহওয়াত মর্দ রা' আহ্‌ওয়াল কুনাদ

যেস্তেকা'মাত রূহ রা' মুব্‌দাল কুনাদ"

ক্রোধ ও কামনা মানুষকে টেরাচোখ বানায়

অবিচলতার বদলে অন্তরকে বিপথে চালায়।

ক্রোধ ও কামনা প্রবল হলে স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব-এ দু'টি আপদ চলে আসে মানুষের সামনে। মানুষ তখন বিপদগামী হয়। ভাল-মন্দ ফারাক করতে পারে না। কারণ, মনে কুমতলব আসলে মনের সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে যায়। তখন চোখ থাকতেও টেরাচোখ বা অন্ধ হয়ে যায়।

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل بسوی دیده شد.

"চোন গরয আ'মদ হুনার পূশীদা শুদ

সাদ হেজা'ব আয দেল বসূয়ে দীদা শুদ"

কুমতলব যখন সামনে আসে মনের সৌন্দর্য লুকিয়ে যায়

মন থেকে শত পর্দা এসে চোখের সামনে আড়াল হয়ে যায়।

তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-

چون دهد قاضی بدل رشوت قرار

کی شناسد ظالم از مظلوم زار.

"চোন দাহাদ কা'যী বেদেল রিশওয়াত কারা'র

কেই শেনা'সদ যা'লেম আয মযলূমে যা'র।"

বিচারক যখন স্থান দেয় অন্তরে তার ঘুষ

যালিম-মযলুমে ফারাক চিনতে থাকে না তার হুশ।

(সূত্র: মসনবী শরীফ, ১ম খন্ড, বয়েত নং ৩২৪ পরবর্তী।)

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর

গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে

নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাসিক পরওয়ানা

ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

আউলিয়া

সূফী শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ খাযা

যাঁর দাওয়াতে লাখো মানুষ দ্বীন গ্রহণ করে

মুহাম্মাদ ইবন নূর

লাখো অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসকল ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাপানের বহু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ।

জাপানে তিনি যখন গিয়েছিলেন, সেখানে হাতে গোনা দুই চারটের বেশি মসজিদ ছিল না। অথচ পরবর্তী চৌদ্দ পনের বছরে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রায় ৪০০টি মসজিদ।

চীনে পবিত্র কুরআন মাজীদের বিশ হাজার মাসহাফ বিতরণ করেন।

তিনি একটি সেমিনারে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম তুলে ধরেছেন, আর সেখানেই তাৎক্ষণিক শতাধিক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার বিখ্যাত শাইখ নাযিম আল-হাক্কানীর শিষ্য ছিলেন।

শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ খলীল ইবরাহীম ইয়ুর্ত, নিয়ামাতুল্লাহ খাযা নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। যার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন জাপান, চীন ও ইউরোপের লাখো মানুষ। সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম সফল এই আল্লাহর ওলী মহান আল্লাহ তাআলার রহমতের আশ্রয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন গত জুলাই মাসের ৩১ তারিখ।

শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ খাযা উসমানী খিলাফতের পতনের পরপর যিনি শত বছরের উসমানী ঐতিহ্যের ধারক তুরস্কের আমাসিয়া প্রদেশের তাশুফা জেলায় ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা-মা দুজনেই তুর্কি ছিলেন, বাবার নাম ইবরাহীম; মায়ের নাম খাতুন ইয়ুর্ত। বাবা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম।

শৈশবে তুরস্কের বিখ্যাত আলিমদের নিকট পড়াশুনা করেন, যাদের অনেকেই ছিলেন খলীফা আব্দুল হামীদ (র.) এর ধর্মীয় উপদেষ্টা। নকশবন্দিয়া তরীকার বিখ্যাত শাইখ নাযিম আল-হাক্কানীর শিষ্য ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়্যিব এরদোয়ান, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট নাযিম এরবেকান ও প্রভাবশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা আব্দুল্লাহ গুলও নাযিম হাক্কানীর শিষ্য। শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ নিজেও ছিলেন তাসাওউফের উচ্চস্তরের বুযুর্গ। ১৯৫৫ সালে তিনি তুরস্কের ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুল শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ জামিউস সুলতান আহমদে মুআযযিনের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি তুরস্কের বিখ্যাত দুই ইমাম মুহাম্মাদ এফেন্দী ও সাইয়্যিদ শফীক আরওয়াসীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।

তুরস্কে কিছু দিন মুআযযিনের দায়িত্ব পালন শেষে নিয়ামাতুল্লাহ খাযা চলে যান পবিত্র মক্কা নগরীতে। সেখানে জাবালে নূরের নিকটবর্তী আল আশরাফ অঞ্চলের একটি মসজিদে শিক্ষকতা ও ইমামতি করেন। মদীনা শরীফেও তিনি দীর্ঘ দিন অবস্থান করেছিলেন। দুই পবিত্র শহরে তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন।

তারপর ডাক আসে জাপান থেকে। সেখানকার ইসলামিক সেন্টারের প্রথম হিসেবে যোগ দিতে চলে যান জাপান। শুরু হয় এক নতুন জীবনের। অমুসলিমদের নিকট হৃদয়গ্রাহ্য করে ইসলামের বাণী উপস্থাপন করাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান দায়িত্ব।

পুরো জীবন সাফল্যের সাথে এই দায়িত্ব আনজাম দেন। লাখো অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসকল ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাপানের বহু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ। জাপানে বসবাসরত অন্যান্য দেশের অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকেও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর নিকট। জাপানে তিনি যখন গিয়েছিলেন, সেখানে হাতে গোনা দুই চারটের বেশি মসজিদ ছিল না। অথচ পরবর্তী চৌদ্দ পনের বছরে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রায় ৪০০টি মসজিদ।

জাপানে তিনি শুধু ইসলাম প্রচারই করেননি, বরং নওমুসলিমদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। জাপানে বিভিন্ন সময় মীলাদুন্নবী ﷺ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিও সবার সামনে তুলে ধরতেন তিনি।

তাঁর ইসলাম প্রচার জাপানেই থেমে থাকেনি। ১৯৮১ সালে তিনি চীন সফর করেন। এ সময় চীন সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে চীনে পবিত্র কুরআন মাজীদের বিশ হাজার মাসহাফ বিতরণ করেন। সম্ভবত চীনের ইতিহাসে আর কখনো এতো বেশি সংখ্যক কুরআন মাজীদ কারো একক উদ্যোগে বিতরণ করা হয়নি। জাপান ও চীন ছাড়াও আরো বহু অমুসলিম দেশে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন। সফর করেছেন অর্ধশতাধিক দেশ।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যাদের নিকট যেতেন, তাদের মাতৃভাষায় ইসলামের মূল শিক্ষাটুকু সহজবোধ্য করে তুলে ধরতেন।

বুঝিয়ে দিতেন— শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ব আর রাসূলের রিসালতের স্বীকৃতি দিলেই, এবং এটুকু মুখে উচ্চারণ করলেই মুসলিম হওয়া যায়। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য তুলে ধরার পর যখন ইসলাম গ্রহণের এই সহজ পন্থাটি মানুষের সামনে তুলে ধরতেন,তখন সাগ্রহে সবাই ইসলাম গ্রহণ করতেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সময় জাপানের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও ইসলাম প্রচার করতেন তিনি।

এমনও হয়েছে, তিনি একটি সেমিনারে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম তুলে ধরেছেন, আর সেখানেই তাৎক্ষণিক শতাধিক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে সকল নওমুসলিমের জন্য আলাদা আলাদা করে নাম ঠিক করা অনেক সময় সম্ভব হতো না। এরকম পরিস্থিতিতে তিনি ঘোষণা দিতেন, এখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে সকল পুরুষের নাম এখন থেকে 'মুহাম্মাদ' আর সকল নারীর নাম 'ফাতিমা'। অবশ্য সাধারণত তিনি সকল নওমুসলিমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ঠিক করে দিতেন, এবং এক্ষেত্রে নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামের নামই বেশির ভাগ সময় রাখতেন।

অমুসলিমদের পাশাপাশি যেসকল মুসলিম ইসলামের শিক্ষা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যও তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। এসব ক্ষেত্রেও তাঁর দাওয়াতী পদ্ধতি ছিল বিস্ময়কর এবং অভিনব। এরকম একটি ঘটনা আমরা পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

জার্মানির বার্লিন শহরের এক মসজিদে একবার তিনি দুই ঘণ্টার জন্য গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন, মসজিদে উপস্থিতি খুবই কম। জানতে চাইলেন, এই এলাকার অন্য মুসলমানরা এখন কোথায়? তাঁকে জানানো হলো, এখানকার বেশির ভাগ মুসলমান মসজিদে না এসে পানশালায় মদ্যপান করতে গিয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে ওদের নিকট নিয়ে চলুন। পানশালায় গিয়ে তিনি প্রথমেই সবাইকে সম্বোধন করলেন 'প্রিয় মুজাহিদগণ' বলে!সবাই চমকে গিয়ে জানতে চাইলো, এখানে মুজাহিদ আবার কে? বললেন, তিনটি কারণে আপনাদেরকে মুজাহিদ বলছি। প্রথমত, জার্মানিতে আপনারা মুসলিম নাম ধারণ করে বসবাস করছেন, এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সবাইকে ইসলামের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, আপনারা এখানে হালাল উপার্জনের জন্য এসেছেন। তৃতীয়ত, আপনাদের পূর্বপুরুষগণ তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন, আর আপনারা তো তাদেরই উত্তরসূরী। পানশালায় এমন উপস্থাপনার ফলে শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। এরপর তিনি তাঁদেরকে আরো কিছুক্ষণ নসীহত করলেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহ্য বয়ানের ফলে সেই পানশালার বেশির ভাগ মুসলিম পানশালা ছেড়ে মসজিদের দিকে ফিরে আসেন। তাঁর অভিনব দাওয়াতী পদ্ধতির এমন আরো বহু কাহিনী জানা যায়। (এ ঘটনাটি প্রখ্যাত আরব ইতিহাসবেত্তা ড. আলী সাল্লাবী তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে পোস্ট করেছেন।)

একবার মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তার হাতে বহু চীনা অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা শাইখের নিকট অভিযোগ করেন যে, ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া যে এতো সহজ, এই বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। তাদেরকে কোন মুসলিম এর আগে দাওয়াত দেননি। শাইখ নিজেও বিভিন্ন সময় ইসলাম প্রচারে মুসলমানদের উদাসীনতার বিষয়টি নিয়ে আফসোস করতেন।

আনাদোলু এজেন্সিকে নিয়ামাতুল্লাহ খাযার এক বন্ধু উমর ফারূক আওজাক যাদা জানান, শাইখ তুর্কি, আরবী, ফার্সি, ইংরেজি, উর্দু, জাপানি— এই ছয়টি ভাষায় সাবলীল কথা বলতে পারতেন। তাঁর এই ভাষা জ্ঞানের সুবাদে যাদেরকে তিনি দাওয়াত দিতেন, তাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হতেন।

দীর্ঘদিন থেকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। শারীরিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। তারপরও তুরস্কের ইস্তাম্বুলে তাঁর পাঠদানের কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছিলেন নবতিপর বৃদ্ধ এই শাইখ। গত জুলাই মাসের ৩১ তারিখ ইস্তাম্বুলের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাসজিদুল ফাতিহতে জানাযার নামায শেষে তাকে দাফন করা হয় তুরস্কের মাকবারাতু আইয়ুব সুলতানে।

শাইখ নিয়ামাতুল্লাহ খাযার ইন্তিকালের পরও তার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের সিলসিলা থেমে নেই। তাঁর জীবদ্দশায়ই বহু দাঈ শাইখের দাওয়াতি পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এখনো বিভিন্ন দেশে অমুসলিমদের মধ্যে তাঁর অনুসারীরা দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

বর্তমান বিশ্বে জাপান ও চীন হচ্ছে ধর্ম থেকে বিচ্যুত ও চরম বস্তুবাদী দুটি দেশ। এরকম দুটি দেশে শাইখ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত নকশবন্দিয়া তরীকার এই মহান বুযুর্গের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও অভিনব সহজবোধ্য দাওয়াতি কৌশলের ফলেই তিনি এমন সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

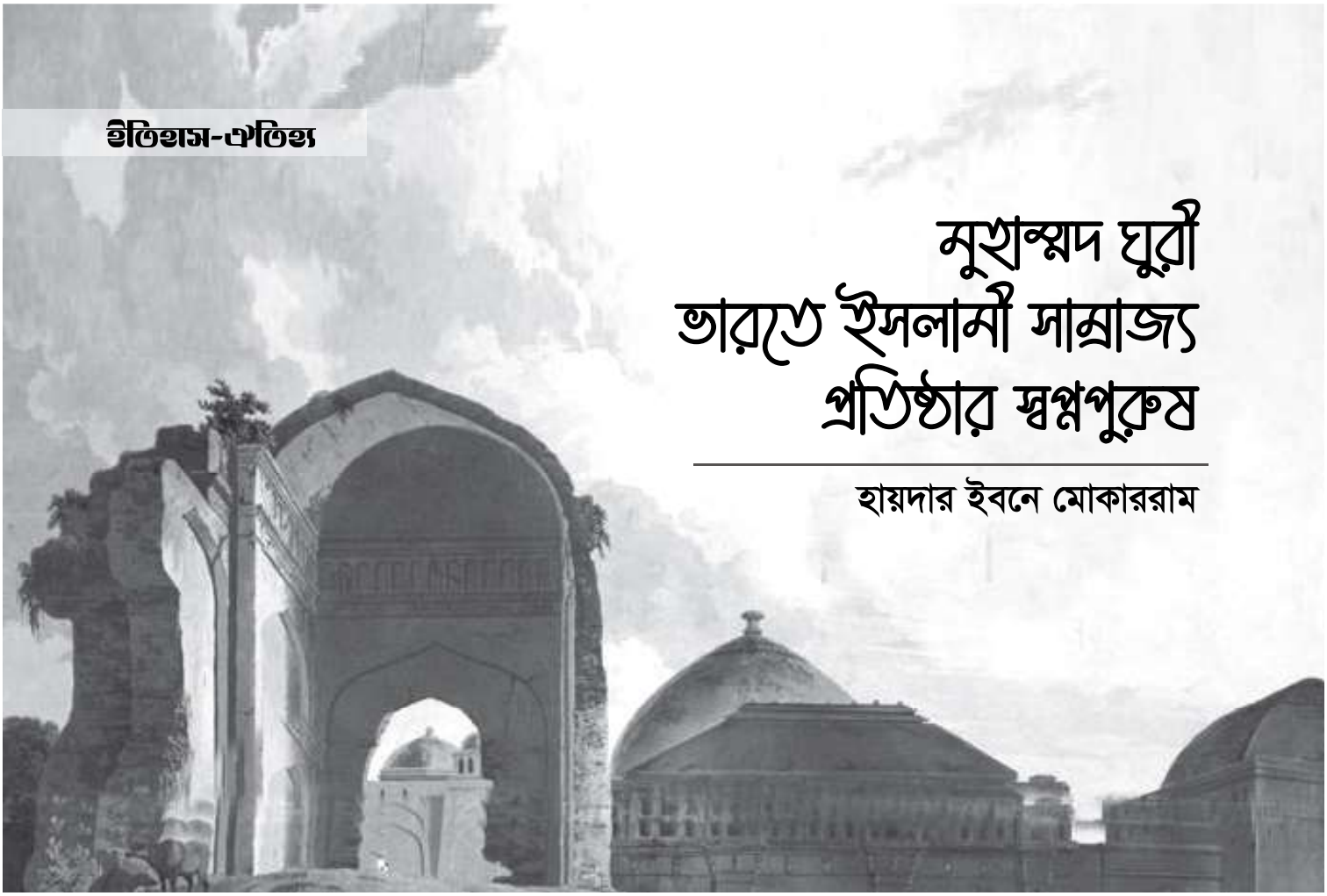

মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপুরুষ

হায়দার ইবনে মোকাররাম

মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম অভিযানকারীর গৌরব অর্জন করলেও তাঁর আকস্মিক ইন্তিকালের কারণে তিনি ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। পরবর্তীতে গজনীর সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত অভিযান করলেও ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে যেতে পারেননি। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'ঘুর' রাজ্যের অধিপতি মুহাম্মদ ঘুরী তৃতীয় পর্যায়ে ভারত অভিযান পরিচালনা করে সর্বপ্রথম ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের গৌরব অর্জন করেন। বারবার বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তিনি প্রবল ধৈর্য ও সাহসের বলে ভারত দখল করে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আমরা মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাব।

জন্ম ও শৈশব

তাঁর প্রকৃত নাম মুইজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাম। উপাধি শিহাবুদ্দীন। ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ সম্পর্কে জানা যায়নি। ধারণা করা হয়, ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আফগান ঘুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'ঘুর" রাজ্যটি ছিল গজনী ও হেরাতের মধ্যবর্তী পর্বতঘেরা অঞ্চলে। ঐতিহাসিক লেনপুল ঘুরী বংশকে আফগান বংশবদ বলে উল্লেখ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই মুইজুদ্দীন প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। সমকা-লীন জ্ঞানী- গুণী পণ্ডিতদের সাহচর্যে তিনি প্রথমে ইসলামী শিক্ষা এবং পরবর্তীতে সামরিক ও প্রশাসনিক বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ক্ষমতার মসনদে আরোহণ

ঘুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন জাহান সুজ। ১১৬১ সালে তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র সাইফুদ্দীন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সাইফুদ্দীন তুর্কিদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র গিয়াসুদ্দীন ক্ষমতার মসনদে বসেন। তখন গজনীর বিশাল অংশের শাসন ছিল অঘুজ তুর্কিদের হাতে এবং গজনী রাজ্য কেবল পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১১৭৩ সালে গিয়াসুদ্দীন অঘুজ তুর্কিদের হটিয়ে গজনী দখল করেন এবং শাসনভার স্বীয় ভ্রাতা মুইজুদ্দীনকে 'শিহাবুদ্দীন' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। মুইজুদ্দীন বিন সাম ইতিহাসে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষ অভিযান ও রাজ্য বিস্তার

ক্ষমতা লাভের পর মুহাম্মদ ঘুরী দ্রুত গজনীর শাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে তিনি রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। এর মধ্য দিয়ে ঘুরীর নেতৃত্বে মুসলমানদের তৃতীয় পর্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয়াভিযানের সূচনা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন সকল অভিযান খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো। ১১৭৫ সালে মুহাম্মদ ঘুরী শত্রুদের হকচকিত করতে গোমাল গিরিপথ দিয়ে ডেরা ইসমাঈল খানে এসে পৌঁছান। ঘুরী মুলতানের ধর্মদ্রোহীদের সাথে তীব্র লড়াই করেন এবং তাদের পরাজিত করে মুলতানে ইসলামের শাসন কায়িম করেন।

মুলতানের শাসন ব্যবস্থা আয়ত্তে আসার পর ঘুরীর চোখ পড়ে সিন্ধুর ভাট্টি রাজাদের উচ রাজ্যের দিকে। ১১৭৮ সালে তিনি উচ রাজ্য দখল করেন এবং গুজরাটের রাজধানী আনহিলের দিকে রওয়ানা দেন। কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত মুসলিম বাহিনী গুজরাটরাজ দ্বিতীয় ভীমের নিকট পর্যুদস্ত হয়। মুহাম্মদ ঘুরী

তাৎক্ষণিক গুজরাট থেকে পিছু হটেন। এর প্রায় এক শতাব্দী পর গুজরাট মুসলমানদের আয়ত্তে এসেছিল।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, গজনী বংশের শাসন কেবল পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দূরদর্শী সমরবিদ মুহাম্মদ ঘুরী বুঝতে পারলেন, পাঞ্জাব বিজয় না করলে ভারতে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আবার তিনি ভারতে অভিযান পরিচালনা না করলে পাঞ্জাবের দুর্বল শাসক খসরু মালিকের পক্ষে ভারতাভিযান সম্ভব নয়। ১১৮৬ সালে ঘুরী পাঞ্জাব দখল করেন। খসরু মালিককে বন্দি করে গজনীতে পাঠানো হয়। এরপর শুরু হয় ঘুরীর আসল পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় তিনি সকল অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়লাভ করেছিলেন।

তরাইনের যুদ্ধ

পাঞ্জাব দখলের পর মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর বিজিত স্থানসমূহে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত অভিযানের লক্ষ্যে শক্তিশালী রাজপুতদের দমনের প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। এরই মধ্যে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজ বুঝতে পারে যে, ঘুরীর দিল্লী আক্রমণ অত্যাসন্ন। চৌহানরাজ সকল হিন্দু রাজপুতদের একত্র করে একটি কনফেডারেশন গঠন করে মুসলমানদের ভারত আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য। ঐতিহাসিক টডের মতে, কনৌজের রাজপুত জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকায় সে কনফেডারেশনে যোগদান করেনি। পৃথ্বীরাজ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জয়চন্দ্রের কন্যাকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বিয়ে করে। চূড়ান্ত অপমানিত রাজা জয়চন্দ্র অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুহাম্মদ ঘুরীকে ভারত অভিযানের আমন্ত্রণ জানায়। অবশ্য ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ তার A short history of Muslim rule in India গ্রন্থে বলেন, 'জয়চন্দ্রের এই দুর্ঘটনা না ঘটলেও ঘুরীর ভারত আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী ছিল।' ১১৯১ সালে ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তীবাহিনী ও কয়েক হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদ ঘুরী কর্ণাট ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী প্রান্তর তরাইনে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ রায় বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুহাম্মদ ঘুরী পিছু হটেন। এ যুদ্ধে ঘুরী আহত হন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

মুহাম্মদ ঘুরী এতে দমে যাননি। মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে সেসব থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রতিজ্ঞা করে ১১৯২ সালে এক লাখ ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ আবারও তিনি তরাইনের প্রান্তরে হাযির হন। মুসলিম বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণে পৃথ্বীরাজ বাহিনী দিশেহারা ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেনাপতি গোবিন্দ রায় যুদ্ধরত অবস্থায় এবং পৃথ্বীরাজ পলায়নকালে নিহত হয়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারত ঘুর রাজ্যের সীমানাভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক স্মিথ তার The Early History Of India গ্রন্থে বলেন, "১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে একটি যুগ সন্ধিক্ষণকারী সংঘর্ষ বলা যায়। যা হিন্দু মুসলিম আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে উৎকৃষ্ট দল ভারত শাসনের সুযোগ পায়।" ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "পৃথ্বীরাজের পরাজয় হিন্দু রাজপুতদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যার দরুন উত্তর ভারতের দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত শহরের ফটকগুলো মুহাম্মদের জন্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে।" (Medieval India undar Mohammadan Rule)

মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনে থেমে থাকেননি। তিনি একে একে সামানা, হানসি, সরস্বতী, কনৌজ, বারানসী প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। আজমীর দখল করে তিনি পৃথ্বীরাজের এক পুত্রের হাতে শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁর সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেকের কাছে ভারতের বিজিত অঞ্চলসমূহের ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি ঘুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন দক্ষ সমরবিদ এবং মানবিক শাসক। মধ্য এশিয়া ও ভারতে কয়েকবার তিনি পরাজয়ের শিকার হলেও দমে যাননি। তাঁর প্রচেষ্টা তাকে প্রথম ভারতে ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনকারী সুলতানের গৌরবে ভূষিত করেছে। ভারতে প্রথম ইসলামী আইন তাঁরই মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ এ সম্পর্কে বলেন, He laid the foundation of Muslim rule in India. Which entered from Afganistan to Bengal. He proved himself not only a great warrior but also a wise statesman. (A short history of Muslim rule in India)

-তিনি ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি আফগানিস্তান থেকে বাংলা পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি কেবল একজন মহান যোদ্ধা নন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কও বটে।

আজীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। প্রখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী, আধুনিক কবি নিজামী ও উরফজীকে তিনি পৃষ্টপোষকতা দিয়ে গেছেন। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত গজনী রাজ্যকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নতুন করে গড়ে তুলেছেন।

রাজকার্যে তিনি ছিলেন মানবিকতার উদাহরণ। প্রজাদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না বরং মানবিকতা দিয়ে সবার মন জয় করেছিলেন। শাসকগণ আনুগত্য করলে তিনি সমঝোতার পথ বেছে নিতেন। চেষ্টা করতেন, নতুন বিজিত অঞ্চলে স্থানীয় রাজা নিয়োগ দিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর চিরশত্রু পৃথ্বীরাজের ছেলেকে তিনি আজমীরের শাসনকর্তা বানিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ঘুরীর আল্লাহভীতি ছিল প্রবল। তৎকালীন সম্রাটদের মতো তিনি কাউকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেননি। বরং বড়ভাই গিয়াসুদ্দীনের প্রতি তাঁর ছিল বিস্ময়কর আনুগত্য। পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় এবং দানখয়রাত ছিল তাঁর অবসরের সোপান। ঐতিহাসিক ফিরিশতা বলেন "মুহাম্মদ সে যুগের ব্যতিক্রম ছিলেন। বিজয়ে তিনি খুশি কিংবা পরাজয়ে আতঙ্কিত হতেন না। তাকওয়াবান, প্রজাহিতৈষী ও সত্যনিষ্ঠ হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। এজন্য ভারতীয় অনেক ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসা করেছেন।" (Feristhta's History of Dekkan)

ইন্তিকাল

সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেকের হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে ঘুরী তাঁর রাজ্য 'ঘুর'এ চলে যান। অল্পসময় পর খাওয়ারিজমের শাহের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি পরাজিত হন। এতে পাঞ্জাব ও মুলতানে খোক্কার উপজাতির নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঘুরী কুতুব উদ্দিন আইবেকের সহায়তা চাইলে বিশ্বস্ত আইবেক প্রভুর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং খোক্কারদের বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যগুলো পুনরুদ্ধার করেন। ১২০৬ সালে গজনী ফেরার পথে খোক্কার বংশের এক আততায়ীর হাতে মাগরিবের নামাযরত অবস্থায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ইন্তিকালের পর খাওয়ারিজমের শাহ ঘুর রাজ্য দখল করেন। অন্যদিকে ভারত শাসিত হতে থাকে ঘুরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেকের হাতে।

স্মরণ

ইলমে কিরাতের নিরলস খাদিম

মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.)

আবু ছালেহ মো. নিজাম উদ্দীন

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইংরেজি, মঙ্গলবার ৬৭ বছর বয়সে মালিক মাওলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

জীবদ্দশায় তিনি সিংহভাগ সময় কাটিয়েছেন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের খিদমতে। পাশাপাশি ইলমে হাদীসের খিদমতেও তাঁর রয়েছে বর্ণিল অবদান। তাসাউফের জগতেও তিনি একজন প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নিঃস্বন্দেহে তিনি ছিলেন আল্লাহর এক মকবুল ওলী ও একজন আশিকে রাসূল ﷺ। তাঁর সমগ্র জীবন পরিচালিত হয়েছে সুন্নাতে নববীর অনুসরণে।

তিনি ছিলেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর খুব কাছের ও স্নেহধন্য একজন প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন। মুর্শিদের প্রতি তাঁর মুহব্বত, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল উঁচু স্তরের। ছিল হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা ও সীমাহীন আনুগত্য। লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল, যেকোন খানকাহ বা ওয়ায মাহফিলে যখন রাসূলে পাক ﷺ বা তাঁর মুরশিদের বয়ান/শান গাওয়া হতো তখন তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরতো। এ যেন রাসূলের প্রতি তাঁর মহব্বত ও মুর্শিদ প্রেমের অন্যতম এক নিদর্শন। তিনি মোট ১১ বার পবিত্র হজব্রত পালন ও জিয়ারতে মদীনার সফর করেন।

১ জুন ১৯৫৪ সালে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ (বর্তমান শান্তিগঞ্জ) উপজেলার ঘোড়াডুম্বুর গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা মো. আব্দুল কাদির (র.)। পিতা-হাজী মো. রুশন আলী, মাতা-আফতাবান বিবি। পিতা-মাতার ধর্মানুরাগ শিশু আব্দুল কাদির (র.) কে ইসলামী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। বাল্যশিক্ষা পিতৃগৃহে অর্জনের পর প্রাথমিক শিক্ষা নেন সিলেট সদর উপজেলার হাউসা ইসলামিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসায়। পরবর্তীতে তিনি ছাতক উপজেলার লাকেশ্বর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। এরপর সিলেটের অন্যতম দ্বীনি বিদ্যাপীঠ সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৭৫ ইং সনে একই মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল উত্তীর্ণ হন। তিনি সৎপুরে পড়াশোনায় থাকাকালীন সময়ে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা গোলাম হোসাইন সৎপুরী (র.) এর সংস্পর্শে থেকে ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন।

তিনি আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন ১৯৭৪ সালে। এরপর থেকে জীবনের শেষ অবধি কুরআনুল কারীমের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে কুরআন শরীফের খিদমত শেষে পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নির্দেশে দারুল কিরাতের খিদমতে ১৯৮৭ সনে চলে যান ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে। ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি সেখানেই প্রতি রামাদান মাসে ইলমে কিরাতের খিদমতে রত ছিলেন। দেশ, বিদেশে তাঁর দারুল কিরাতের অগণিত ছাত্র রয়েছেন। তিনি কুরআন তিলাওয়াতে খুব তৃপ্ত হতেন। প্রতি রামাদান মাসে দারুল কিরাতের সকল ক্লাস রুটিন মাফিক সম্পন্নের পর তাকে প্রায় ১৫/১৬ টি কুরআনের খতম করতে দেখা যেত। সারা বছর আরো অসংখ্য কুরআনের খতম করতেন তিনি। এছাড়াও তাঁকে প্রায় অবসর সময়েই যিকর আযকার ও বিভিন্ন দুরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখা যেত।

তিনি ১৯৭৫ সালে তাঁর উস্তায হযরত মাওলানা আবুল ফযল মো. ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরী (র.) এর নির্দেশে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসায়। এক পর্যায়ে তিনি আরবী প্রভাষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এবং শেষ বয়সে কামিল জামাতে তাফসীরে বায়যাভী শরীফের দারস প্রদান করতেন। এ প্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘ ৪০ বছর ইলমের খিদমত আনজাম দেওয়ার পর ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মাদরাসার উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এ প্রতিষ্ঠানের সুখে-দুঃখে তিনি অনেক শ্রম ও ঘাম ঝরিয়েছেন। মাদরাসার শিক্ষক, কমিটি, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর সাথেও তাঁর আচরণ ছিল অমায়িক। তাই সকলে তাঁকে সম্মানের চোখে দেখেছেন সবসময়। ফলশ্রুতিতে একসময় তিনি "বুরাইয়ার হুযূর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইলমে কিরাত ও হাদীসের খিদমতের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে প্রায়ই বয়ান রাখতেন। খুব সাবলীল ভাষায় দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি তুলে ধরতেন প্রজ্ঞার সাথে। দেখা যেত মানুষেরা আগ্রহভরে তাঁর বয়ান শুনতেন।

তিনি হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর একজন মাজায ছিলেন। ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছ থেকে ইলমে ক্বিরাতের পাশাপাশি ইলমে হাদীস ও দালাইলুল খাইরাতের সনদও লাভ করেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ছাড়াও তাঁর ইলমে কিরাত ও হাদীসের উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ হলেন, হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী, হযরত মাওলানা গোলাম হোসাইন (র.) সৎপুরী, হযরত মাওলানা হবিবুর রহমান (মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর), হযরত মাওলানা নজমুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার গোটারগ্রামী (র.), হযরত মাওলানা আবুল ফযল মো. ইরশাদ হোসাইন গোয়াহরী (র.), হযরত মাওলানা আব্দুন নুর হাউসার হুযূর (র.), হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম তেলীকুনী (র.), হযরত মাওলানা ইজ্জত উল্লাহ নোয়াপাড়ী (র.), হযরত মাওলানা আব্দুশ শাকুর চৌধুরী (র.), জনাব ক্বারী গোলাম রব্বানী লাউগাঙ্গী (র.), হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কাইমগঞ্জী (র.) ও হযরত মাওলানা মুবাশ্বির আলী প্রতাবপুরী প্রমুখ।

তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ইযাজতক্রমে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত খানেকা মাহফিল পরিচালনা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলীর ইযাজতক্রমে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ১৭টি খানকাহ মাহফিল পরিচালনা করতেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেলেও মনের দিকে ছিলেন অনেকখানি সবল। যার কারণে শেষ বয়সে এসেও তিনি এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন মানুষের আত্মশুদ্ধির সবক দানে।

তিনি ছিলেন সদাহাস্যোজ্বল, সহজ সরল, নিরহংকারী ও পরোপকারী একজন মানুষ। সকলের বিপদে তিনি এগিয়ে আসতেন সর্বাগ্রে।

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির (র.) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তার রেখে যাওয়া দ্বীনি খিদমাতসমূহ তাঁকে জিইয়ে রাখবে কিয়ামত অবদি। মহান আল্লাহ পাক তাঁর মকবুল বান্দাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন

খাতুন

শিশুর হাতে মোবাইল নয় বই দিন

সৈয়্যদা নাদিরা হোসেন

মোবাইল একটি নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র। এর ব্যবহারের ব্যাপকতা অনেক। তাই ছোট বড় সবার হাতেই মোবাইল ফোন দেখা যায়। কারো প্রয়োজনে, কারো বিনোদনে। মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা।

শিশুদেরকে খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, মনভোলানো, শান্ত করা এমনকি বর্ণমালা ও ছড়া শেখানোর কাজটিও মোবাইলের কারণে বাবা মায়ের জন্য অনেক সহায়ক হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু অভিভাবকরা বুঝতে পারছেন না এতে করে শিশুদের মোবাইল আসক্তি বাড়ছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে বিশ্বের প্রতি তিনজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজন শিশু।

শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ

ক) শিশুরা মাতাপিতাকে অনুসরণ করে। পিতামাতা শিশুদের সামনে মোবাইল বেশি ব্যবহার করলে মোবাইল ব্যবহারে তাদের কৌতুহল বাড়ে।

খ) মা-বাবা নিজেকে সময় দিতে গিয়ে শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দেন। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মা-বাবার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে ১-৫ বছরের শিশুদের মধ্যে মোবাইল আসক্তি বাড়ছে।

গ) শিশুদের দুষ্টুমি থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে মোবাইল দেওয়া।

ঘ) পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকা।

ঙ) সর্বোপরি অভিভাবকের অসচেতনতা ও আলসেমি।

কিভাবে বুঝবেন শিশু মোবাইল ফোনে আসক্ত

বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা শিশুর আচরণ দেখে নিচের বিষয়গুলোকে মোবাইল আসক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন।

১। মোবাইল সরিয়ে নিলে কান্নাকাটি করে ও অপরিচিত কাউকে দেখলে সেখান থেকে সরে যায়।

২। রেগে যায় ও খিটমিটে স্বভাব হয়। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৩। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করে না।

৪। রাতে ঠিকমত ঘুমায় না। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৫। মা-বাবার অবাধ্যতা বেড়ে যায়, জেদ ধরে, ভাঙ্গচুর করে। এককথায় নেশাগ্রস্তের মতো আচরণ করে।

শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে বিশেষজ্ঞদের মতামত: দেশ বিদেশের চিকিৎসক, গবেষক, মনোবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব বাস্তবে লক্ষ্য করে উদবিগ্ন। তাঁরা ইউটিউব, বিভিন্ন চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা প্যারেন্টিং, কনসাল্টিং ও বিভিন্ন কেস স্ট্যাডি তুলে ধরে শিশুদের হাতে মোবাইল ফোন না দেওয়ার জন্য অভিভাবককে অনুরোধ করেছেন। কিছু কিছু অভিভাবক মনে করেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারে শিশুর কাজ সহজ হচ্ছে ও শিশুরা শিখতে পারছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে ভিন্ন কথা। বিজ্ঞানের দাবি, শিশুদের হাতে মোবাইল ফোনসহ কোনো ইলেকট্রনিক গেজেট দেওয়া উচিত নয়। এতে নানারকম রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয় শিশু এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত একুশে টেলিভিশন অনলাইনকে বলেন, মোবাইল ফোন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এর থেকে নির্গতরশ্মি শিশুদের দৃষ্টিশক্তিকে ভীষণ ক্ষতি করে। তিনি মোবাইল ফোন শিশুদের জন্য সিগারেটের চেয়েও ক্ষতিকর বলে দাবি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজা মোবাইল ফোন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য নীরব ঘাতক বলে আখ্যায়িত করেছেন। বুয়েটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আনোয়ারুল ফাত্তাহ একুশে টেলিভিশনের অনলাইনকে বলেন, শিশুদের মস্তিষ্ক ইলেকট্রনিক পণ্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর রশ্মি ধারণের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া মোবাইলের যে ভলিউম তার কম্পন খুবই ভয়াবহ। শিশুরা এক নাগাড়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে তাদের মৃগি রোগ ও হাঁপানীর ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা এক মিনিট মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কে যে কম্পন সৃষ্টি হয় তা স্থির হতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। ওই গবেষণায় আরো দাবি করা হয় যেসব বাচ্চারা দৈনিক পাঁচ/ছয় ঘণ্টা মোবাইল ব্যবহার করে তাদের বুদ্ধির বিকাশ সাধারণ বাচ্চাদের তুলনায় কম হয়। বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম (শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ) সমাধান সূত্রের এক অনুষ্ঠানে বলেন, চার বছরের আগে কোনো শিশুর হাতে যেন মোবাইল ফোন দেওয়া না হয়। তিনি বলেন, মোবাইল ব্যবহারের ফলে শিশুর ভাষার বিকাশ হয় না এবং শিশুর সামনে কোনো মা-বাবা মোবাইল ব্যবহার না করার অনুরোধ করেন। সম্প্রতি মাইক্রোসফট কর্তা বিল গেটস অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন, কোনো অবস্থাতেই তারা যেন চৌদ্দ বছরের

আগে সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে না দেন। তার নিজেরও ২০, ১৭ ও ১৪ বছরের তিন সন্তান। তাদের কেউই হাই স্কুলে ওঠার আগে মোবাইল হাতে পায়নি। গেটস জানিয়েছেন, বাবা মার দায়িত্ব পালন খুব সহজ কাজ নয়।

তাছাড়া খাওয়ার সময়, ঘুমানোর সময় ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল স্ক্রিন নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন ব্রিটিশ চিকিৎসক দল। শিশুকে আচরণগত সমস্যার ঝুঁকি থেকে দূরে রাখতে চাইলে তার হাতে স্মার্ট ফোন না দেওয়ার কথা বলেছে জার্মানির লাইপজিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (WHO) তথ্য অনুযায়ী মোবাইল ফোন থেকে নির্গত রেডিয়েশন পসিবলি কার্সিনোজেনিক অর্থাৎ এই রেডিয়েশন থেকে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। বিশেষ করে রেডিয়েশনের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি মস্তিষ্কে। কারণ শিশুদের ব্রেনের ত্বক, টিস্যু ও হাড় খুব পাতলা হয়।

ফলে রেডিয়েশনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে দ্বিগুণ বেশি। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী রেডিয়েশনের প্রভাব শিশুদের ব্রেইনের নার্ভে পড়ে। যা থেকে খুব সহজেই ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয় শিশু মস্তিষ্ক। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সন্তানকে স্মার্ট ফোন দেওয়ার অর্থ হলো, তাদের হাতে এক বোতল মদ কিংবা এক গ্রাম কোকেন তুলে দেওয়া। কেননা, স্মার্ট ফোনের আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই বিপদজনক।

অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের যে যে রোগ ও সমস্যা দেখা দেয়

১. মায়োপিয়াসহ চোখের বিভিন্ন রোগ: স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো চোখের রেটিনার ক্ষতি করে যা দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে পারে। জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শিশু চক্ষু রোগ বিভাগের প্রধান ড. খায়ের আহমদ চৌধুরী বলেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে দেশের ১-৫ বছরের শিশুদের চোখের রোগ গত ৫ বছরে ৩ থেকে ৪ গুণ বেড়েছে।

২. কানের রোগ: মোবাইল ফোনের রেডিয়েশনের প্রভাবে কানের চারপাশ ও মাথা গরম হয়ে যায় এবং শিশুর পাতলা কানের পর্দায় ও নার্ভে প্রভাব ফেলে। ফলে কানে কম শোনা থেকে নানা রকম কানের জটিল রোগ দেখা দিতে পারে।

৩. স্থূলতা বেড়ে যায়: দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে থাকার ফলে শিশুর স্থূলতা বেড়ে যায় এবং সে হাঁটা, চলা ও দৌড়ানোর সক্ষমতা হারায়।

৪. পুষ্টিহীনতা ও পরিপাকে বাধাগ্রস্ত: খাওয়ার সময় মোবাইল ফোন চালু থাকলে পুষ্টির চেয়ে রেডিয়েশন বেশি ঢোকে। স্ক্রিনের দিকে মনোযোগ থাকায় খাবারের স্বাদ, গন্ধ ও রঙের তফাৎ বুঝতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে হজম প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যায়।

৫. রক্তচাপ বাড়া ও হার্ট এ্যাটাকের আশঙ্কা: মোবাইল ফোন থেকে মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন শিশুর শরীরে সহজে প্রবেশ করে যার ফলে প্রভাব পড়ে মস্তিষ্ক, হার্ট ও লিভারে। এসব অঙ্গের ক্ষতি হয় বলেই এখন বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানী ফোনের প্যাকেটে নির্দিষ্ট সেন্টিমিটার দূরে রেখে কথা বলার নির্দেশনা লিখে দেয়।

৬. স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়া: মোবাইল রেডিয়েশন ব্রেনের গভীরে প্রবেশ করে মনোসংযোগ ও পড়াশোনা বোঝার ক্ষমতা কমায়। ফলে স্কুলে যাওয়া ও পড়তে অনীহা এবং ছোট বয়সেই মানসিক অবসাদ ডেকে আনে।

৭. ভাষার বিকাশ হয় না: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক পাক্ষিক যোগাযোগ হয়। যা শিশুর ব্রেনের ডেভলপমেন্টে বাধার সৃষ্টি করে। সুস্থ্য মস্তিষ্কের জন্য দরকার দ্বি পাক্ষিক যোগাযোগ। যার ফলে শিশুর ভাষার বিকাশ হয় না এবং দেরিতে কথা বলে। তাই যাদের শিশু কথা বলতে দেরি হচ্ছে তাদের শিশুকে মোবাইল ফোন না দেখানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

৮. ক্যান্সার ও ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে: এ প্রসঙ্গে সানিস স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডিন ডেভিড কার্পেন্টার বলেছেন, শিগগিরই আমরা হয়তো একটি মহামারি রোগের শিকার হতে পারি এবং সেটি হবে মস্তিষ্কের ক্যান্সার।

৯. কাঁধ, কনুই ও কব্জির জয়েন্ট ক্রমশ অকেজো হয়ে যায়। গাঢ় ও মাথা ব্যাথা করে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

১০. অটিজম: মোবাইল ফোনের রেডিয়েশনের ফলে শিশুর ব্রেনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় বিধায় শিশুর শারীরিক মানসিকসহ সব দিকের বিকাশ হয় না। এবং অটিজম কট্রাম ডিজ অর্ডার দেখা দেয়। তাছাড়া গেইমিং ডিজ অর্ডার ও আত্মহত্যা প্রবণতার মতো মানসিক রোগও দেখা যায়।

শিশুদের মোবাইল ফোনে আসক্তি দূর করার উপায়

শিশুদের মোবাইল ফোন আসক্তি দূর করার উপায় জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ানলাইট ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী শারমিন আহমদ। তার মতে, মোবাইল নিয়ে শিশুদের আসক্তির ফলাফল শুভ নয়। শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমাতে যে কাজগুলো করতে পারেন–

১. শিশুর সঙ্গে গল্প করা: গল্প করলে শিশুর মানসিক ও ভাষার বিকাশ বৃদ্ধি পায়। একাকিত্ব দূর হয় এবং স্থিরতা আসে। শিক্ষামূলক গল্প সৎচরিত্র গঠনে সহায়ক।

২. শিশুর সামনে ডিভাইস না রাখা: ঘরে

ঢুকতেই একটা বড় টিভি। টেবিলের উপর রাখা স্মার্ট ফোন। এক মিনিট পর পর ডিভাইস দেখা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ শিশুরা প্রথম শিক্ষা পায় পরিবার থেকে। শিশুর সামনে এগুলো দেখা পরিহার করতে হবে। শিশুর জন্য ঘর, ঘরের জন্য শিশু নয়।

৩. ছবি আঁকার উপকরণ হাতের কাছে রাখা: শিশুর হাতের কাছে রং তুলি, খাতা ও ছবি আঁকার উপকরণ রাখা। পারলে ঘরের একটি দেওয়াল কালো রং করে রাখা। এতে সে একা থাকলে ছবি, বর্ণসহ ইচ্ছামতো আঁকাজোকা করবে। মোটকথা কোনো একটা বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করা। তবে এক্ষেত্রে শরীআতের বিধি-নিষেধ লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছপালাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা শিখানো যেতে পারে।

৪. হাতের কাছে প্রচুর বই রাখা: রং বেরঙে নানা রকমের বই বাসায় শিশুর হাতের কাছে রাখা। নিজে বই পড়ুন, খবরের কাগজ পড়ুন আপনাকে দেখে তার মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে উঠবে। মোবাইল আসক্তি দূর করার কার্যকরী উপায় বই। তার পছন্দের বই কিনে দিয়ে মোবাইল আসক্তি দূর করা যায়। বই থেকে শিশুরা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। বই মনের চোখ খুলে দেয় ও জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ও মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ব্যরিস্টার মিতি সানজানা বলেন, বিনোদনের জন্য মোবাইলের পরিবর্তে শিশুদের হাতে বই তুলে দেওয়া উচিত। বই পড়ার মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যতে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবে। বিকল্প উপায় হিসেবে বই পড়ার কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

৫. প্রকৃতির কাছে যাওয়া: শিশুকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে গেলে নির্মল বাতাস, উদার আকাশ, সবুজ গাছপালা, ফল-ফুল, প্রজাপতি পাখি দেখে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে জ্ঞান লাভ করবে। কবি নির্মল বসুর লেখা 'সবার আমি ছাত্র' কবিতা নাড়া দিবে তার কোমল মনে। প্রকৃতির মাঝে ডুবে গিয়ে শিশু ভুলে যাবে মোবাইল ফোনের কথা।

৬. বিভিন্ন রকম খেলার মাধ্যমে: খেলতে ভালোবাসে না এমন শিশু পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। ইনডোর, আউটডোর, সবরকম খেলায় অভিভাবকরা তাদের সাথি হবেন। সোফার কোশন দিয়ে ঘর তৈরি, ভাষার খেলা, বুদ্ধির খেলা, বয়স, স্থান ও সময় অনুযায়ী যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই মিলে খেলাধুলা করলে মোবাইল আসক্তি ভুলে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে শিশু। খুব ছোট শিশুর সাথে আয়না দেখিয়েও খেলা যায়।

৭. পছন্দের জিনিস কিনে দিয়ে: শিশু কী পছন্দ করে অবশ্যই তার মা বাবা বুঝতে পারেন। তা খাবার, পোষাক, জুতা যাই হোক। শিশুকে সাথে নিয়ে কিনে আনলে এতে মোবাইল আসক্তি দূর হতে পারে।

৮. শিশুর কথা মনোযোগ সহকারে শোনা: মা-বাবা বাহিরে কাজ করছে, ঘরে আসলেই শিশু দৌড়ে গিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কোলে ওঠতে চায়– এতে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য সহকারে হাসিমুখে কথা বলা ও সঙ্গ দেওয়া উচিত। একসাথে খেতে বসাও কার্যকর একটি পন্থা।

৯. উদাহরণ ও কৌশলে উপেক্ষা করা: মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে কার কী কী অসুবিধা হয়েছে তা উদাহরণ আকারে শিশুর সামনে উপস্থাপন করা। ধনী-গরীব সকল শ্রেণির শিশুদের সাথে খেলতে ও মিশতে দিয়ে ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া। সরাসরি ধমক বা মেরে কোনো কিছু নিষেধ না করা। এতে হয় সে দ্বিগুণ ক্ষতি করবে নয়তো চুপসে যাবে। ফলে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তাদের অযৌক্তিক দাবি কৌশলে উপেক্ষা করা। প্রয়োজনে প্রসঙ্গ পাল্টানো এবং পিতামাতা একই কথা বলা। কখনো বিপরীতের অবস্থান না করা।

১০. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি অনুষ্ঠান: কিরাত, হামদ, নাত, কবিতা পাঠ, মিলাদ মাহফিল ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া অথবা ছোটখাটো বনভোজনের আয়োজন করার মাধ্যমে মোবাইল ফোনের আসক্তি দূর করা যায়।

১১. শিশুদের ফোন থেকে দূরে রাখা: পিতামাতার মনে রাখতে হবে ওষুধের মতো মোবাইল ফোনও শিশুর নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে। মা-বাবার মোবাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখা, শিশু ঘুমানোর সময় শিশুর শোবার ঘরে মোবাইল না রাখা, শিশুদের কাছে বেশি মোবাইলে কথা না বলা বা ইন্টারনেট ব্যবহার না করা উচিত।

১২. শিশুকে কাজে ব্যস্ত রাখা: শিশুকে দিয়ে বাগান করানো, ছাদকৃষিতে পানি দেওয়া বা গাছ লাগানো, হাঁস মুরগী কবুতর পালন ও গৃহের ছোট ছোট কাজ তাদের সাথে নিয়ে করলেও মোবাইলে আসক্তি অনেক কমে আসতে পারে। তাছাড়াও গোসলের সময় সাথে নিয়ে সাঁতার শেখানো, নামাযের সময় সাথে নিয়ে মসজিদে যাওয়া, পরিবারে সবাই মিলে এক সাথে খেতে বসা ও ব্যায়াম করা।

অভিভাবককে রোল মডেল হতে হবে। বাবা মা শিশুর সামনে মুখোমুখি বসবেন, গল্প করবেন, অধিক সময় দিবেন। নতুবা নিজের ক্ষতিতো হবেই শিশুকেও সে ক্ষতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। আজ যে পরিমাণ সময় তার পেছনে ব্যয় করবেন, বুড়ো হলে সন্তানরাও সে পরিমাণ সময় আপনাকে দিবে। কাজের বুয়া বা ডে-কেয়ারে রেখে কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদের মানুষ করে তুলতে হবে ধৈর্য, সময় ও কঠোর শ্রম দিয়ে। নতুবা ঠিকানা হবে বৃদ্ধাশ্রম। সন্তানকে অধিক সময় দেওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও সংযোগ বাড়ানো এবং অভিভাবক বা মাতাপিতার অভ্যাসের পরিবর্তনে শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

শিশু আল্লাহর দেওয়া সেরা নিআমত। এই নিআমত আল্লাহর দেওয়া আমানত মনে করে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর দেখানো ও শেখানো শিক্ষায় ধৈর্য সহকারে লালন পালন করতে হবে। পিতামাতার জন্য সন্তানরা সাদকায়ে যারিয়া। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, নিশ্চয় নিজের সন্তানকে উত্তম ব্যবহার শেখানো গরীবকে শস্যদান করার চেয়েও উত্তম। (মুসলিম)

পিতামাতার ত্যাগ ও কষ্টের স্মৃতিগুলো শিশু মনের মণিকোঠায় স্থায়ীভাবে জমা থাকবে– কৃতজ্ঞতায় চোখ অশ্রু সজল হবে, দুআ করবে 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা' হে আমার রব! তাদের দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, পত্রপত্রিকা ও প্যারেন্টিং সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

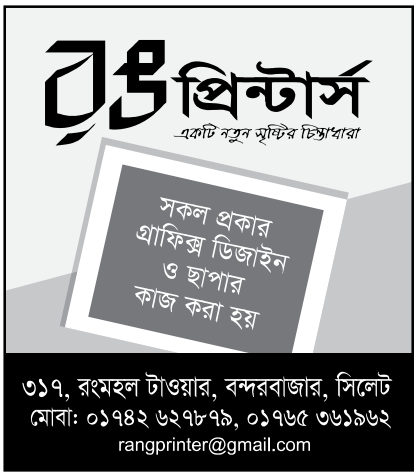

ভ্যাকসিনের ইতিহাস

মুমিনুল ইসলাম

১৫ শতকের দিকে চীনারা স্বীকার করেছিল যে, যারা একবার গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছে তারা পুনরায় সংক্রমণের জন্য অনাক্রম্য। তারা এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্ক্যাব (চামড়া কেটে সেটা শুকনা করে নেয়া) সংরক্ষণের ধারণা নিয়ে এসেছিল যারা হালকা রোগে ভুগছিল। পরে তাদের স্ক্যাব শুকিয়ে সেগুলো গুঁড়ো করে পিষে মানুষের নাসারন্ধ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের জন্য এটি ছিল ডান নাসারন্ধ্র, মেয়েদের জন্য ছিল বাম নাসারন্ধ্র।

এভাবেই সাধারণত টিকার গল্প শুরু হয়, যদিও সেই সংস্করণটি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ। টিকা দেওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর ছিল তা স্পষ্ট নয়। চীনারা যদিও গুটিবসন্তের একটি সফল টিকা আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন, তবুও বৃটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনারকে আধুনিক টিকার প্রথম আবিষ্কারক ধরা হয়। ১৭৯৬ সালে তিনিই প্রথম গুটি বসন্তের কার্যকর টিকা তৈরি করেন। এজন্য তাকে 'ফাদার অব ইমিউনোলোজি' বলা হয়।

থেমে থেমে বারবার গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে শত শত বছর ধরে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছিল। গুটি বসন্ত থেকে রেহাই পেতে ছোটবেলায় জেনারও ভাইরিওলেশন (আক্রান্ত রোগীর চামড়া কেটে সেটা শুকনা করে শ্বাস নেওয়া) চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসক হওয়ার পর তিনিও তার রোগীদের ভ্যারিওলেশ সম্পন্ন করছিলেন। তরুণ এই চিকিৎসক পড়াশোনা শেষ করে গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা দিতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, খামারিরা গোবসন্তে আক্রান্ত হলে তাদের সামান্য ফুসকুড়ি দেখা দেয়। জেনার এও লক্ষ্য করলেন, এতে করে খামারি ও গোয়ালিনীরা আর মরণব্যাধি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হচ্ছে না।

জেনার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এক পর্যায়ে ১৭৯৬ সালের মার্চে সারা নেলমস নামের এক তরুণ গোয়ালিনীর গায়ের গোবসন্তের তাজা ক্ষত থেকে জেনার টিকার উপাদান সংগ্রহ করেন। এ উপাদান ব্যবহার করে তৈরি টিকা সর্বপ্রথম জেমস ফিপস নামের আট (বা তেরো) বছর বয়সী এক শিশুর গায়ে পুশ করেন। ফলাফল ইতিবাচক আসে। জেনার এ পরীক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং আশানুযায়ী ফল পান। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধী টিকার বুনিয়াদ এভাবেই গড়ে দেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী। ১৭৯৮ সালে জেনারের গবেষণাপত্র প্রকাশ হওয়ার পর তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এরপর যত রোগের টিকা তৈরি হয়েছে এটিকে অনুসরণ করেই হয়েছে। যে গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে আঠার শতকে প্রতি বছর শুধু ইউরোপ জুড়েই চার লাখ লোক মারা যেত সেই ভয়ঙ্কর মহামারিটি নির্মূল হয়েছে বলে ১৯৮০ সালে ঘোষণা দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। রসায়ন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ১৮৮৫ সালে জলাতংকের টিকা আবিষ্কার করেন। এ ফরাসি বিজ্ঞানী মহামারি ও মড়কের মূল ঘটক জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে এর চরিত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ফল ও দ্রব্যের পচনের পেছনে যে জীবাণু রয়েছে তা তিনি সামনে আনেন। খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত রাখার যে পদ্ধতিকে আজ আমরা 'পাস্তুরিতকরণ' বলি সে পদ্ধতিটিরও ধারণা দিয়েছিলেন লুই পাস্তুর।

১৮৮৭ সালে লুই পাস্তুর প্রতিষ্ঠা করেন 'পাস্তুর ইনস্টিটিউট' নামে একটি বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পরিমাইলিটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পীতজ্বর এবং প্লেগের মতো ঘাতক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউক্রেনে জন্ম গ্রহণ করা ওয়াল্ডেমার হফকিন (১৮৬০-১৯৩০) অণুজীব বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের গবেষণাগারে কাজের আগ্রহ নিয়ে তরুণ বয়সে ফ্রান্সে পৌঁছেন।

১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার যে বালকের শরীরে প্রথম ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেন তার বাহুর জীবাণু নিয়ে পাস্তুরের গবেষণার সূত্র ধরে পরবর্তীতে কলেরা ও প্লেগের মতো ভয়ঙ্কর দুটি সংক্রামক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন ওয়াল্ডেমার হফকিন। তিনি খরগোশের উপর কলেরার টিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগ্রহজাগানিয়া ফলাফল পান। এই বিজ্ঞানী ১৮৯২ সালের ১৮ জুলাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমবার নিজের উপর কলেরার টিকার পরীক্ষা চালালেন । ফলাফল ইতিবাচক আসলো। সামান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া বিস্ময়কর সাফল্যের দেখা পেলেন। কিন্তু টিকার কার্যকারিতার উপর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রাখলেন। ১৮৯৬ সালে এভাবে তার হাত ধরেই ভয়াবহ প্লেগ রোগের টিকা আবিষ্কার হয়। একপর্যায়ে কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলা ঘাতক এই রোগ দুটির লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়। পোলিও মানুষকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে ফেলতো এমনকি এর ফলে অনেকের মৃত্যুও হতো। সাধারণত এ রোগ হলে হাত-পা শুকিয়ে যায়। এই রোগের টিকা আবিষ্কার হওয়ার আগে অসংখ্য আক্রান্ত মানুষ মারা গেছে। ১৯৫৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী জোনাস এডোয়ার্ড সল্ক (১৯১৪-১৯৯৫) পোলিওর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে প্রায় ৫ কোটি মানুষ মারা যায়। ইতিহাসে এটি স্প্যানিশ ফ্লু নামে পরিচিত। স্প্যানিশ ফ্লুতে প্রতি ৬৭জন মার্কিন সেনার একজনের মৃত্যু হলে সরকার এই মহামারির টিকা আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৫ সালে সামরিক ব্যক্তিদের মাঝে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা প্রয়োগের প্রথম অনুমোদন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। টমাস ফ্রান্সিস জুনিয়র, জোনাস এডোয়ার্ড সল্ক— যারা পোলিও টিকা আবিষ্কার করেছিলেন তারাই ছিলেন এ টিকা তৈরির গবেষকদলের মূল ব্যক্তি। ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ ঘটলে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষ মারা যায়। ইতিহাসে 'এশিয়ান ফ্লু' নামে এই মহামারি চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৫৭ সালে হংকং থেকে ছড়িয়ে পড়া এশিয়ান ফ্লু মহামারি আকার ধারণ করার শুরুতেই মার্কিন বিজ্ঞানী মরিস হিলম্যান তার সহকর্মীদের নিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এ লেখাটির সকল তথ্য USA based বিখ্যাত TIME magazine এ-A Vaccine Against Covid-19 Would be the Latest Success in a Long Scientific History শিরোনামে প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে নেওয়া।

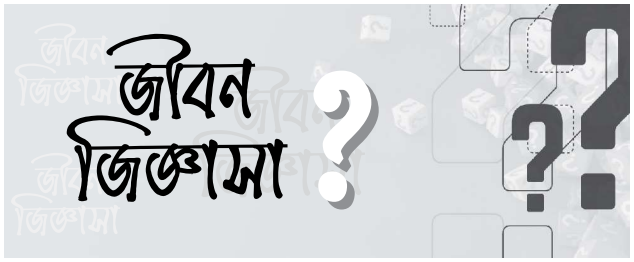

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

আরিফ হোসেন
ভৈরবপুর, ভৈরব

প্রশ্ন: এসপিসি (SPC world express) নামক একটি এপ্লিকেশন রয়েছে, যেখানে ১২০০ টাকা দিয়ে একেকটি একাউন্ট খুলতে হয়। অতঃপর সেখান থেকে ইনকামের ব্যবস্থা হচ্ছে; ১) অন্য কাউকে রেফার করলে সেখান থেকে ৫০০ ইনকাম হয় ২) প্রতিদিন একাউন্টে ৫টি করে এডভার্টাইজমেন্ট আসে। এসবের একেকটা প্রায় ৪ সেকেন্ড দেখে সাবমিট করতে হয়। একটা সাবমিট করলে ২ টাকা। ৫ টা বিজ্ঞাপনে মোট ১০ টাকা। এভাবে যতগুলো বিজ্ঞাপন সে অনুযায়ী ইনকাম হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো উপরোক্ত দুইটি নিয়ম অনুসারে ইনকাম করা কি শরীআতের দৃষ্টিতে জায়িয?

জবাব: উপরোল্লোখিত দিকসহ SPC world express এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়াবলিতে শরীআতের দৃষ্টিতে আরো বহু অসুবিধাজনক বিষয় রয়েছে, যা এর পুরো কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালাচনা করলে বের হয়ে আসবে। কেননা এতে সম্পৃক্ত হয়ে ইনকাম করার পদ্ধতিতে রয়েছে-রিশওয়াহ, ধোঁকা, প্রতারণা, শর্তে ফাসিদ, যুলুম, সুদ, বিনিময়হীন শ্রম, শ্রমহীন বিনিময় এবং অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আহরণ ইত্যাদি নানাবিধ শরীআত পরিপন্থি বিষয়। যেগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এসপিসির কার্যক্রম, তাদের লেনদেন ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী বৈধ নয়। তাদের সদস্য হয়ে কাজ করা, এখান থেকে ইনকাম করা জায়িয নয়।

SPC World Express সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় তারা তাদের কার্যক্রম এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত করে। আর MLM পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শরীআহসম্মত নয়, হারাম।

SPC World এ ১২০০ টাকা দিয়ে যোগদান করতে হয়। পরবর্তী কাজ হলো বিজ্ঞাপন দেখলে টাকা দেওয়া হয়। এখন বিজ্ঞাপন দেখা যদি ইনকাম সোর্স হয় তাহলে এখানে ১২০০ টাকা দেওয়া হলো মূল কাজের অতিরিক্ত টাকা প্রদান, যাকে রিশওয়াহ (ঘুষ) বলা হয়। এটি শরীআহ সমর্থিত নয়, হারাম।

এখানে নিচের লেভেলে কাউকে যুক্ত করতে পারলে তার টাকা থেকে আপনাকে দেওয়া হবে ৪০০/৫০০ টাকা। এভাবে আপনার ডাউন লেভেলে যারা আছে তারা আরো যাদের যুক্ত করবে সেখান থেকেও আপনাকে একটি কমিশন দেওয়া হবে। এভাবে একজনের শ্রমের টাকা অন্যজনকে প্রদান করা হয়। যাকে 'আল আজর বিলা আমল' বলা হয়। ইসলামী শরীআতে এটাও হারাম। আপারলেভেলে যিনি আছেন তিনি কোনো শ্রম বা বিনিময় ছাড়াই কমিশন লাভ করলেন। আর এভাবে উপকার লাভ করা শরীআহ সমর্থন করে না, এ পদ্ধতিও নাজায়িয।

এগুলো ছাড়াও তাদের নিয়ম নীতির মধ্যে অনেক হারাম বিষয় যুক্ত। যেমন-তাদের এখান থেকে টাকা তোলার জন্য তাদের পণ্য ক্রয় করতে হয়। পণ্য ক্রয় না করলে টাকা তুলতে পারবেন না। এমন শর্তারোপ করা বৈধ নয়। তাদের কার্যক্রমের আরেকটি দিক হলো ৫০০ টাকার নিচে হলে টাকা তুলতে পারবেন না। এটাও এক ধরনের প্রতারণা। সুতরাং তাদের সদস্য হয়ে কাজ করা, এখান থেকে ইনকাম করা জায়িয নয়।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (بقرة–881)

হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عتاب بن أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، فقال: «انطلق إلى أهل مكة انهم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وشرط» رواه عبيد الله بن موسى (مسند ابى حنيفة)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل» (المعجم الكبير: ح: 1634)

হাদীস শরীফে আরো এসেছে-

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)«صحيح مسلم: باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر)

হাবিবুর রহমান
ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া কামিল মাদরাসা

প্রশ্ন-১: সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতের সাথে দ্বিতীয় আয়াত মিলাতে 'নূনে কুতনী' নামক ছোট নূন হরফ পড়তে হয় কেন?

প্রশ্ন-২: সূরা লাহাবের প্রথম আয়াত পড়ে দুই ঠোট বন্ধ করার কায়দা কী?

জবাব-১: আরবী ভাষার কোনো শব্দের শেষ হরফে তানবীন হলে এবং তার পরবর্তী হরফ হামযায়ে ওয়াসলী হলে মিলিয়ে পড়ার সময় জটিলতা নিরসনে সেখানে তানবীনের নূনকে জের দিয়ে পড়তে হয়। কেননা সেখানে মিলিয়ে পড়ার সময় হামযায়ে ওয়াসলী বাদ পড়ে যায়। এ নূনকে নূনে কুতনী বলা হয়। যেমন: احدٌ الله الصمد– نوحٌ ابنه ইত্যাদি।

জবাব-২: পবিত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের বিশুদ্ধ পদ্ধতি রাসূলে পাক ﷺ থেকে ধারাবাহিক সনদ পরম্পরায় কিরাতের ইমামগণ ও কারীগণের নিকট পৌঁছেছে। তাই আমাদের কিরাতের উস্তাদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তার প্রিয় উস্তাদ শাইখ হাফিয আব্দুর রউফ করমপুরী (র.) এর নিকট থেকে সূরা লাহাবের প্রথম আয়াতের শেষে কলকলাহ না করে উভয় ঠোঁট বন্ধ করে দেওয়ার বিষয় আয়ত্ত করে আমাদেরকে এরূপ কিরাত শিখিয়েছেন এবং তার উস্তাদের মা'মূল বলে এরূপ পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এটি মূলত: ইলমে কিরাতের কোন বিধিবদ্ধ কায়দা বা নিয়মের অনুগামী বিষয় নয়। নির্ভরযোগ্য উস্তাদ থেকে সেমায়ী বা শ্রুতিগত বিষয় হিসেবে অনুকরণীয় একটি বিশেষ পদ্ধতি। তাই এক্ষেত্রে কেউ সনদপ্রাপ্ত উস্তাদের নিকট থেকে বিষয়টি না পেয়ে থাকলে তার জন্য এর অনুসরণ অপরিহার্য নয়। বরং

সে তার স্বীয় সনদপ্রাপ্ত শাইখের অনুকরণ করাই যুক্তিযুক্ত।
উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন মাজীদে এ শব্দ ব্যতীত অন্য সকল স্থানে অনুরূপ শব্দে ওয়াকফের সময় 'কলকলায়ে কুবরাহ' করা হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ ইউনুছ আলী
পালগাঁও, মুন্সির বাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন: বর যদি বিদেশে থাকে আর কনে দেশে অথবা কনে বিদেশে বর দেশে এমন অবস্থায় তাদের বিবাহ কি ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে করা যাবে? শরীআহ কী বলে।

জবাব: ছেলে মেয়ে দুই দেশে থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে কিংবা ভিডিও কনফারেন্সে বিবাহ করলে শরীআতের বিধান অনুযায়ী উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবেনা। কেননা বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল কমপক্ষে দুজন স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান মুসলমান সাক্ষীর সামনে বর/কনের কেউ প্রস্তাব দিবে আর অপরপক্ষে বর/ কনের কেউ তা কবুল করবে এবং সাক্ষীগণ উভয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনবে। শরীআহসম্মত আবশ্যকীয় এসকল শর্তাবলি পরিপূর্ণভাবে টেলিফোন কিংবা ভিডিও কনফারেন্সে বিবাহে পাওয়া অসম্ভব। তাই টেলিফোন বা ভিডিও কনফারেন্সে বিবাহ বৈধ নয়।

অবশ্য বর/কনের কোনো এক পক্ষ অপরপক্ষ যেখানে থাকে সেখানের কোনো ব্যক্তিকে ওকীল বানাবে। তারপর সে ওকীল দুজন সাক্ষীর সামনে উক্ত বিবাহ করিয়ে দিবে। তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া সরাসরি মোবাইলে বা টেলিফোনে প্রস্তাব ও কবুল করার দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে না। এ সম্পর্কে আদ দুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الاصح

(আদ দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮)

বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্ত হল শরীআতের মুকাল্লাফ (যাদের উপর শরীআতের বিধান আরোপিত হয়) এমন দুইজন আযাদ পুরুষ সাক্ষী বা একজন আযাদ পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে হবে, যেন প্রস্তাবনা ও কবুল বলার সময় উভয়ে বক্তব্য উপস্থিত থেকে শুনতে পায়। (আদ দুররুল মুখতার)

খুলাসাতুল ফাতাওয়া কিতাবে লিখেছেন-কোনো মহিলা তাকে বিবাহ করার জন্য কোনো পুরুষকে ওকীল বানাল (দায়িত্ব অর্পণ করল) অতপর উক্ত ওকীল সাক্ষীগণের সম্মুখে বলল যে তোমরা সাক্ষী থাক যে আমি (স্বয়ং) অমুক মহিলাকে বিবাহ করলাম তাহলে সাক্ষীগণ উক্ত মহিলাকে চিনে থাকলে এবং অমুক দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে বুঝতে পারলে নাম না বললেও বিবাহ বৈধ হবে। আর চিনে না থাকলে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য তার নাম ও পিতার নাম বলা আবশ্যক। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮)

জাদীদ ফিকহী মাসাইল কিতাবে লিখেছেন-বর/কনের কোনো এক পক্ষ ফোনে (৩য় পক্ষ হিসেবে) কাউকে বিবাহ সম্পাদনের জন্য ওকীল বানালে এবং উক্ত ওকীল অপর পক্ষের সম্মুখে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে (প্রাপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী) যথাযথ ইজাব ও কবুলের দায়িত্ব সম্পাদন করে বিবাহ দিলে তা শুদ্ধ হবে।

সুতরাং টেলিফোনের মাধ্যমে বিবাহ করতে হলে অবশ্যই উপরোক্ত বৈধ পদ্ধতিদ্বয়ের যে কোনোটি অবলম্বন করতে হবে। নতুবা বিবাহ সহীহ হবে না।

আব্দুল্লাহ

প্রশ্ন: আমাদের মহল্লার ইমাম সাহেব ইকামতে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময় দাঁড়ান। এতে আরো কয়েকজন ইমাম সাহেবকে বাধা দিয়ে এভাবে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করেন। আমি জানতে চাই, 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময় দাঁড়ানো কি জায়িয নয়?

জবাব: ইকামতে দাঁড়ানোর বিষয়টি অনেকটা ইমামের সম্মান এবং অনুসরণের প্রতি নির্ভর করে। ইমামের অবস্থা অনুযায়ী এ মাসআলার উত্তরও ভিন্ন হবে। যেমন- ১. ইমাম যদি মেহরাবে আগে থেকেই বসা থাকেন তাহলে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী ইমাম ও মুসল্লী দাঁড়াবেন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়।

إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ

-মুআযযিন যদি ইমাম না হন এবং ইমাম মুসল্লীদের সাথে মসজিদে উপস্থিত থাকেন এমতাবস্থায় মুআযযিন যখন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলবেন তখন ইমাম ও মুসল্লী দাঁড়াবেন। এটি আমাদের তিন ইমামের মত। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৩৫)

তবে এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার আগে দাঁড়ানো যাবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হলো হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার পর আর বসে থাকা যাবে না, কিন্তু এর আগে দাঁড়ানো যাবে না;এমনটি নয়। আল্লামা তাহতাবী (র.) বলেন,

والظاهر احتراز عن التاخير لا التقديم، حتى لو قام اول الإقامة لا بأس به

একথা সুস্পষ্ট যে, এর চেয়ে (হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর চেয়ে) দেরী করা যাবে না, কিন্তু আগে করা যাবে না এমন নয়। সুতরাং কেউ যদি ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার, ২/১৬০; ইলাউস সুনান, ৪/৩২৮)

২. ইমাম যদি মেহরাবে বসা না থাকেন বরং মসজিদের বাহির থেকে পিছন দিক দিয়ে আসেন তাহলে দাঁড়ানোর নিয়ম হলো, ইমাম যখন যে কাতার অতিক্রম করবেন তখন সে কাতারের মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

وإن دخل من وراء الصفوف فالصحيح أنه كلما جاوز صفا قام ذلك الصف

(বাদাইয়ুস সানাঈ, ১/২০১)

إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ

(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া, ১/৩৫)

৩. ইমাম যদি মেহরাবে বসা না থাকেন বরং ইকামতের সময় মসজিদের সামন দিয়ে প্রবেশ করেন তাহলে তাকে দেখামাত্র সকল মুসল্লি দাঁড়িয়ে যাবেন।

إن دخل الإمام من قدام الصفوف فكما رأوه قاموا؛ لأنه كلما دخل المسجد قام مقام الإمامة

(বাদাইয়ুস সানাঈ, ১/২০০)

وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه — الدر المختار ١/٥١٦

(আদ দুররুল মুখতার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১৬)

মারজান মোহাম্মদ রুহি
পরগনা বাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন: সালাম প্রদানে বা জবাবে হাত উঠানোর হুকুম কী? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব: সালাম প্রদানে সালামের বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথে হাত উঠানো জায়িয। তবে সালামের বাক্য উচ্চারণ ব্যতীত কেবল হাত

উঠানো মাকরূহ। এ সম্পর্কে ইমাম নবুবী (র.) তার الاذكار নামক সুপ্রসিদ্ধ কিতাবে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন,

باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ

(অধ্যায়: হাত কিংবা এরূপ অন্য কিছু দ্বারা ইশারা করে শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত সালাম দেওয়া মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে)

উক্ত অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে ইমাম নববী (র.) এর সরাসরি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইয়াহুদী ও নাসারাগণের সালাম প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কীয় হাদীস উল্লেখ করে বাক্য উচ্চারণ ব্যতীত শুধু হাত উত্তোলনপূর্বক সালাম প্রদান মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

উপরন্তু উক্ত অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম প্রদানে হাত দ্বারা ইশারা করেছেন বলে সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে যে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে উক্ত হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন-

فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة

-এটি এভাবে প্রযোজ্য হবে যে, উক্ত সালামে রাসূলুল্লাহ ﷺ শব্দ ও ইশারা একত্রিত করেছেন। (আল আযকার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬;রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫, অধ্যায়: باب كيفية السلام)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন: ইয়াযীদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সিদ্ধান্ত কী? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব।

জবাব: ইয়াযীদকে কাফির বলা প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আইম্মায়ে কিরামের দুটি মত পাওয়া যায়। আলিমদের এক দল তাকে কাফির মনে করতেন। আরেকদল তাকে কাফির বলতেন না, তবে তাকে লা'নতের উপযুক্ত ফাসিক মনে করতেন।

ইয়াযীদ প্রসঙ্গে আল্লামা তাফতাযানী (র.) শরহু আকাইদে নাসাফীতে লিখেন,

فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه وعلي أنصاره وأعوانه

-আমরা (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত) ইয়াযীদের ব্যাপারে এমনকি তার ঈমানের প্রশ্নেও নিরবতা পালন করব না। আল্লাহর লা'নত ইয়াজীদের উপর, লা'নত তার সাহায্য-সহযোগিতাকারীদের উপর। (শরহে আকাইদে নাসাফী, পৃষ্ঠা-১৬২)

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন,

الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين

-আমার প্রবল ধারণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালাতের ওপর এই খবীসের কোনো ঈমানই ছিল না। ইয়াযীদ আল্লাহর হারাম (মক্কা), নবীর হারাম (মদীনা) এবং পুতঃপবিত্র আহলে বাইতের সাথে তাদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় যা করেছে এবং তার থেকে দ্বীনের প্রতি যে বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে তা তার ঈমানহীন হওয়ার দুর্বল কোনো প্রমাণ নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় সে মুসলমান ছিল তবে সে এমন মুসলমান যে অবর্ণনীয় অনেক কবীরা গুনাহ করেছে। আমি তাকে নির্দিষ্টভাবে লা'নত দেওয়া জায়িয মনে করি। (তাফসীর রূহুল মাআনী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২২৮)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু ইয়ালা, কাযী ইয়ায, ইবন আকীল, ইবনুল জাওযী, যাহবী, হাইতামী, আসকালানী, ইবন কাসীর, সুয়ুতী, তাফতাযানী ও শাওকানীসহ আহলুস সুন্নাতের অগণিত উলামা-আইম্মা ইয়াযীদকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বেশিরভাগই তাকে ফাসিক ও লা'নতের যোগ্য বলেছেন।

কেউ কেউ লা'নত দেওয়া থেকে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। তবে ইয়াযীদের প্রশংসা করা নাসিবিয়্যাতের আলামত ও পথভ্রষ্ট লোকদের স্বভাব। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন,

وَأما الْمحبَّة فِيهِ وَالرَّفْع من شَأْنه فَلَا تقع إِلَّا من مُبْتَدع فَاسد الِاعْتِقَاد فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ من الصِّفَات مَا يَقْتَضِي سلب الْإِيمَان عَمَّن يُحِبهُ لِأَن الْحبّ فِي الله والبغض فِي الله من الْإِيمَان وَالله الْمُسْتَعَان.

-ইয়াযীদকে ভালোবাসা ও তার প্রশংসা করা বাতিল বিশ্বাসী 'বিদআতী' ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই করে না। কেননা ইয়াযীদের এমন সব বৈশিষ্ট্য ছিল যা তার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর ঈমান চলে যাওয়ার দাবি রাখে। এটা এই কারণে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা এবং তাঁরই ওয়াস্তে ঘৃণা করা ঈমানেরই লক্ষণ।

আমাতুল্লাহ

বনশ্রী, ঢাকা

প্রশ্ন: আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে কিন্তু আকদ এখনও হয়নি। বর হবু স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চায়। শরীআহ অনুযায়ী এখন কথা বলা জায়িয হবে কি? শরীআহ অনুযায়ী মোহর কত টাকা নির্ধারণ করা যাবে? আকদের পূর্বে ভরণ-পোষণ, লেখাপড়ার খরচ স্বেচ্ছায় বরের পক্ষ থেকে দেওয়া হলে তা গ্রহণ করা বৈধ কি না?

জবাব: আকদ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো মেয়ে তার সম্ভাব্য বরের জন্য শরীআতের বিধানানুযায়ী বেগানা থেকে যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় পরস্পরের আলাপচারিতা সম্পূর্ণ নাজায়িয।

শরীআতের দৃষ্টিতে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম, যার বর্তমান পরিমাণ হলো ৩০ গ্রাম ৬১৮মিলি গ্রাম রূপা বা এর সমমূল্য। (জাদীদ ফিকহী মাসআলা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩)

উক্ত পরিমাণের উপরে বরের আদায়ের সামর্থ রয়েছে এমন যে কোনো পরিমাণ মোহর বরের সম্মতি সাপেক্ষে ধার্য করা বৈধ রয়েছে। আকদের পূর্বে ভরণ-পোষণের কোনো দায়িত্ব হবু বরের উপর আরোপিত হয় না। তাই বরের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় এমনটা দেওয়া হলেও তা গ্রহণ অনুচিত ও অবৈধ। যেহেতু কোনো কারণবশত: পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হলে ভবিষ্যতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

মো: শাহজাহান আলম

সহকারী শিক্ষক, কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: কখন পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়িয? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব: পানাহার বসে করাই সুন্নাত। তবে দু'প্রকার পানি রয়েছে যেগুলো দাঁড়িয়ে কিবলাহমুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব। যেমন-যমযমের পানি ও উযূর অবশিষ্ট পানি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুপ্রকারের পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন বলে হাদীস শরীফের বহু বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কিরাম এ দুপ্রকারের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব বলে রায় দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে দুরারুল হুক্কাম গ্রন্থে আছে,

وأن يشرب بعده من فضل وضوئه بفتح الواو وهو ما يتوضأ به مستقبل القبلة قائما قالوا لم يجز شرب الماء قائما إلا هاهنا وعند زمزم.

-আর উযূর পর অবশিষ্ট পানি ক্বিবলাহমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উযূর অবশিষ্ট পানি ও যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়িয নয়। (দুরারুল হুক্কাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২;মাজমাউল আনহুর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭)

আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ কিতাবে আছে,

وقيل: لا يشرب قائما إلا في هذا وعند زمزم

-উযূর অবশিষ্ট পানি ও যমযমের পানি ব্যতীত কোনো পানি দাঁড়িয়ে পান করা যায় না। (আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০;তাবয়ীনুল হাক্বাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে আছে,

وفي السراج: ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضوعين

আস সিরাজ কিতাবে রয়েছে, উক্ত দুটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব নয়। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)

মো. সাজিদুল ইসলাম

ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু ইমাম সাহেবের মাধ্যমে জবাই করালে তাকে কুরবানীর গোশতের অংশ দিতে হবে কি?

জবাব: কুরবানীর জন্তু জবাই করা কিংবা কাটার জন্য কাউকে এর গোশত দিয়ে মজুরী দেওয়া যাবে না। সুতরাং ইমাম সাহেবকে গোশত কেবল হাদিয়াহ হিসেবে দেওয়া যাবে, যবেহ করার বিনিময় হিসেবে দেওয়া যাবে না। বিনিময় দিলে তা গোশত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আলাদা পরিশোধ করতে হবে।

এ সম্পর্কে বাদাইয়ুস সানায়ী কিতাবে রয়েছে-

ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها

কুরবানীর গোশত থেকে কসাই কিংবা জবেহকারীকে প্রতিদান বা মজুরী হিসেবে দেওয়া যাবে না। (বাদাইয়ুস সানায়ী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১)

আব্দুল ওয়াসেহ

সুবহানীঘাট, সিলেট

প্রশ্ন: স্বামী-স্ত্রী একত্রে জামাআতে নামায আদায় করলে কিভাবে দাঁড়াবে? পাশাপাশি দাঁড়াবে নাকি আগ-পিছ হয়ে? একাধিক মুহরিম মহিলা সদস্য থাকলে কিভাবে দাঁড়াবে? এক্ষেত্রে ইকামাত কে দিবে?

জবাব: মসজিদের জামাআত না পেলে গৃহে স্বামী-স্ত্রী একত্রে জামাআতে নামায পড়তে পারবে। যদি নামায স্বামী ও স্ত্রী মিলে একত্রে আদায় করে তাহলে স্বামী সামনের কাতারে এবং স্ত্রী সোজা পিছনের কাতারে অর্থাৎ আগ-পিছ হয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। তদ্রুপ একাধিক মুহরিম মহিলা সদস্য থাকলে তারাও পিছনের কাতারে দাঁড়াবে।

এ সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে এসেছে:

قوله أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما

একজন মাত্র মহিলা ইকতিদা করলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। যদি তৎসঙ্গে একজন পুরুষ ইমামের সাথে ইকতিদা করে তাহলে ইমাম উক্ত পুরুষকে ডান পাশে দাঁড় করাবে এবং মহিলাকে তাদের পিছনে দাঁড় করাবে। আর পুরুষ দুজন হলে তাদেরকে সোজা পিছনের কাতারে এবং মহিলাকে তাদের পিছনের কাতারে দাঁড় করাবে।

(রদ্দুল মুহতার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৬, আদ দুররুল মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮)

'বাদাইয়ুস সানায়ী' কিতাবে এ সম্পর্কে লিখেছেন:

وإذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة، وكذلك لو كان معه خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة ولو كان معه رجل وامرأة، أو رجل وخنثى، أقام الرجل عن يمينه والمرأة أو الخنثى خلفه.

(বাদাইয়ুস সানায়ী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯)

স্বামী-স্ত্রী একত্রে নামায আদায়কালে যদি অন্য কোন পুরুষ মুকতাদী না থাকেন তাহলে স্বামী নিজেই ইকামত দিবেন। কেননা নারীদের জন্য আযান ও ইকামত শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, যেহেতু আযান ও ইকামত উচ্চ আওয়াজে দেওয়া জরুরি যা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ।

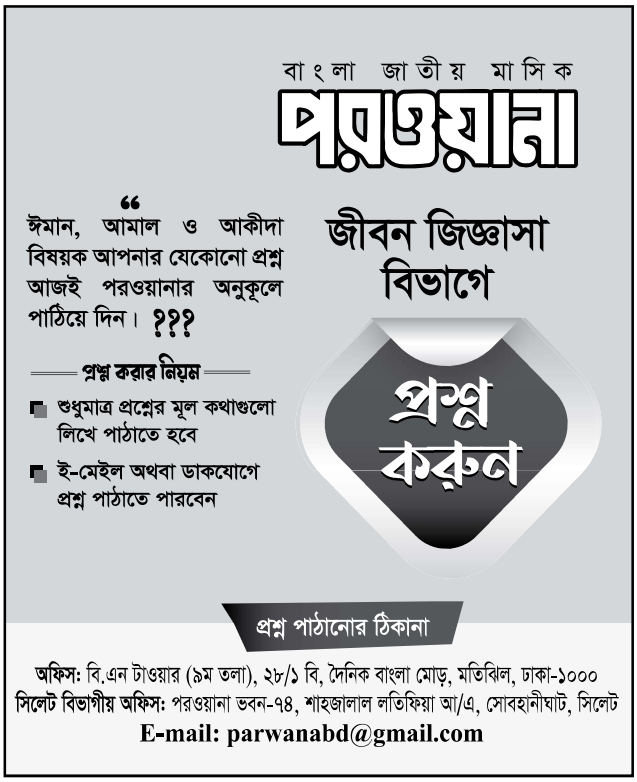

অভ্যন্তরীণ

করোনার প্রাদুর্ভাব নিম্নমুখী

আগস্টের শেষের দিকে দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব নিম্নমুখী হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে মধ্য আগস্টের পর এক সপ্তাহে করোনায় মৃত্যুর হার কমেছে শতকরা ২৭ শতাংশ। নতুন রোগীর সংখ্যা এবং পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হারও নিম্নমুখী। পাশাপাশি করোনার টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলছে দেশজুড়ে। কয়েক দফা বয়সের সীমা কমিয়ে বর্তমানে ২৫ বছর বয়সী সাধারণ নাগরিক ও ১৮ বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে করোনার টিকা প্রদান করা হচ্ছে। টিকার সরবরাহ বৃদ্ধি হলে বয়সসীমা আরো কমানো হতে পারে বলে জানা গেছে। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সারা দেশে টিকার জন্য নিবন্ধন করেছেন সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি নাগরিক। এসময় পর্যন্ত প্রায় সোয়া ২ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর মধ্যে ২ ডোজ টিকা গ্রহণ করেছেন সাড়ে ৬৭ লাখ মানুষ, আর প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছেন প্রায় সোয়া দুই কোটি মানুষ।

বাউ মুরগি : ফার্মে পালন করা হলেও স্বাদে যেন দেশি

খামারে পালন করা হলেও দেখতে আর স্বাদে-গুণে প্রায় দেশি মুরগির মতোই-এমন মুরগির প্রজাতি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের একদল গবেষক। আর তা করা হয়েছে দেশি মুরগির জাত থেকেই।

'বাউ ব্রো মুরগি' বা 'বাউ মুরগি' নাম দিয়ে নতুন জাতের এই মুরগির দুটি স্ট্রেইন বা জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক।

এই গবেষণা দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আশরাফ আলী (অবসরপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক ড. বজলুর রহমান মোল্যা।

নতুন উদ্ভাবিত দুইটি জাতের নাম দেওয়া হয়েছে 'বাউ সাদা' আর 'বাউ রঙিন'। অর্থাৎ একটি মুরগি সাদা রঙের হয়ে থাকে, আরেকটা রঙিন। সাদা বাউ প্রচলিত ব্রয়লার মুরগির চেয়ে একটু শক্ত। তবে রঙিন জাতটির স্বাদ একেবারে দেশি মুরগির মতো। দেড় মাস সময়ে একেকটা মুরগির ওজন হয়ে থাকে গড়ে ৯০০ গ্রাম থেকে এক কেজি পর্যন্ত।

অধ্যাপক ড. বজলুর রহমান মোল্যা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, অনেকগুলো স্থানীয় জাতের জার্মপ্লাজম ব্যবহার করে আমরা দুইটা জাত উদ্ভাবন করতে পেরেছি, যেগুলো ফার্মে পালন করা সম্ভব। এগুলোর স্বাদ প্রায় দেশি মুরগির মতোই সুস্বাদু। (বিবিসি বাংলা)

পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলো পদ্মাসেতুর সড়ক পথ

পদ্মাসেতুর সড়কপথের সর্বশেষ স্ল্যাব বসানো হয়েছে গত ১৯শে আগস্ট। এর মধ্য দিয়ে সেতুটির ৬.১৫ কি.মি দীর্ঘ সড়কপথ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলো। জানা যায়, এর মধ্য দিয়ে মোট ২ হাজার ৯ শত ১৭টি স্ল্যাব বসানোর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সেতুর সড়কপথে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে এখন শুধু পিচঢালাইয়ের কাজটুকু বাকি আছে। সূত্র জানায়, আগামী অক্টোবরের মধ্যেই পিচঢালাইয়ের কাজ সমাপ্ত হবে।

দেশ বরেণ্য দুই আলিমের ইন্তিকালে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর খলীফা মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল, বৃহত্তর সিলেটের বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী ইন্তিকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) গত ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে মৌলভীবাজার পুরাতন সিনিয়র মাদরাসা রোডস্থ নিজ বাস ভবনে ইন্তিকাল করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। মরহুমের জানাযার নামায পরদিন শুক্রবার বাদ জুমুআ হাজার হাজার মুসল্লীর অংশগ্রহণে ও আল্লামা নজমুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীর ইমামতিতে মৌলভীবাজার টাউন ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে বড়লেখা উপজেলার মুড়াউলে নিজ বাড়ীতে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। তাঁর ইন্তিকালে বৃহত্তর সিলেট সহ দেশ-বিদেশে ধর্মপ্রাণ মানুষ ও আলিম-উলামার মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিশিষ্ট এ আলিমে দ্বীনের ইন্তিকালে আনজুমানে আল ইসলাহর মুহতারাম সভাপতি মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা একেএম মনোওর আলী ও তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ দুলাল আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক মুজতবা হাসান চৌধুরী নুমান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে হেফাজতে ইসলামের আমির চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষা পরিচালক দেশের প্রবীণ আলিমে দ্বীন আল্লামা হাফেজ জুনাইদ বাবুনগরী গত ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ৭৩ বছর বয়সি দেশের অন্যতম শীর্ষ এ আলিমে দ্বীন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, কিডনি ও ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তার ইন্তিকালে দেশের বিভিন্ন মহল থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

সিলেট-৩ আসনে উপনির্বাচন ৪ সেপ্টেম্বর

সকল জল্পনা-কল্পনা শেষে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিলেট ৩ আসনের উপনির্বাচন। গত ২৮ জুলাই এ আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণের কথা থাকলেও করোনা মহামারির কারণে কয়েক দফা পেছানো হয় নির্বাচনের তারিখ।

এদিকে নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা। শেষ সময়ে দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচনী আমেজ। প্রার্থীরা বিরামহীন প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এবারের উপনির্বাচনে প্রচার-প্রচারণায় এগিয়ে রয়েছেন আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব। প্রতিদিন ঘুরছেন নির্বাচনী এলাকার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। নির্বাচনী এলাকায় গ্রহণযোগ্য ইমেজ গড়ে তুলেছেন তিনি। দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচনী এলাকার মানুষের সাথে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক ও মানুষের আপদে-বিপদে, সামাজিক অনুষ্ঠানে পাশে থাকায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে নির্বাচনী মাঠে। এছাড়াও জাতীয় পার্টির প্রার্থী আতিকুর রহমান আতিকও রয়েছেন নির্বাচনী মাঠে। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি এ আসনে মজবুত না থাকায় অনেকটা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় রয়েছেন তিনি। দল থেকে বহিস্কার হওয়ার কারণে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নেই সাবেক এমপি শফি আহমদ চৌধুরী। সব সমীকরণ শেষে হাববিবের দিকেই বইছে নির্বাচনী হাওয়া।

আশুরা উপলক্ষে তালামীযে ইসলামিয়ার সেমিনার

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া কেন্দ্র ঘোষীত কর্মসূচি আওতায় দেশব্যাপি পবিত্র আশুরা ও শুহাদায়ে কারবালা স্মরণে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট বিকেলে নগরীর একটি অভিজাত হলে 'কারবালা ও আশুরা : তাৎপর্য ও শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ দুলাল আহমদ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, কারবালার ঘটনা নিছক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং তা ত্যাগের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। সায়্যিদুনা হুসাইন (রা.) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পবিত্র শির মুবারক কুরবানি দিয়েছেন কিন্তু বাতিলের কাছে আপোষ করেননি। আমাদের জন্য কারবালার ঘটনা থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, সত্যের পক্ষে সর্বদা আপোষহীন থাকা।

মহানগর সভাপতি এস এম মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক পিয়ার হাসান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক কাওছার হামিদ সাজুর যৌথ সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুজতবা হাসান চৌধুরী নুমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আহলে বাইতের সদস্যদের মুহাব্বাত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ'য় বিশেষভাবে নির্দেশনা রয়েছে। আহলে বাইতের মুহাব্বাতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল (সা.) কে মুহাব্বাত করা হয়। প্রকারান্তরে আহলে বাইতকে কষ্ট দিলে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেওয়া হয়। বেঈমান ও মুনাফিক মাত্রই আল্লাহর রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেয়। সুতরাং আহলে বাইতের অন্যতম মহান সদস্য হুসাইন (রা.) এর সাথে নিকৃষ্টতর বেয়াদবি যে করেছে সেই ইয়াযিদকে নির্দোষ প্রমাণের হীন চেষ্টা ইসলামি পোশাকে মুনাফিকি ছাড়া কিছু হতে পারে না। আমাদের উচিত আহলে বাইতকে মুহাব্বাত করা ও এসব মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নজমুল হুদা খান। আরো বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা কয়েছুজ্জামান, সিলেট মহানগর আল ইসলাহ'র সাধারণ সম্পাদক আজির উদ্দিন পাশা, সংগঠনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মুহিবুর রহমান ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনজুরুল করিম মহসিন প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক

ইংল্যান্ডে দারুল কিরাত কোর্স সম্পন্ন

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট এর তত্ত্বাবধানে ইংল্যান্ডে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিশেষ কুরআন প্রশিক্ষণ কোর্স 'দারুল কিরাত ২০২১'। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বছরের সবচেয়ে দীর্ঘ ছুটি গ্রীষ্মকালীন ছুটির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর মাসব্যাপী এই কোর্সের আয়োজন করা হয় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সালে দারুল কিরাত এর কাজ ব্যাহত হলেও এ বছর কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে দারুল কিরাত কোর্স।

ইংল্যান্ডের প্রধান কেন্দ্র দারুল হাদীস লাতিফিয়া লন্ডন ছাড়াও ওল্ডহ্যামে অবস্থিত দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্ট, শাহজালাল মসজিদ ম্যানচেস্টার, দারুল কিরাত নর্থাম্পটন, জালালাবাদ জামে মসজিদ লুটন, আনওয়ারুল ইসলাম লতিফিয়া মাদরাসা লুটন, মুসলিম এসোসিয়েশন সলিসব্যরি, বাইতুল আমান মসজিদ ব্রাডফোর্ড, হ্যান্ডসওয়ার্থ জামে মসজিদ বার্মিংহ্যাম এবং শাহজালাল জামে মসজিদ কিথলী শাখায় সর্বোচ্চ ক্লাস ছাদিছ জামাত পর্যন্ত শিক্ষা দানের অনুমোদন দেওয়া হয়। এ বছর এ সকল শাখা থেকে সর্বমোট ১১২ জন শিক্ষার্থী ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৯১ জন উত্তীর্ণ হয়ে কিরাতের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনে সক্ষম হন। ছাদিছ জামাতে পাশের হার ছিল ৮২.৭৩%। অপরদিকে ৫ম ক্লাস বা খামিছ জামাআতের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ১৩০ জন শিক্ষার্থী, যাদের মধ্যে ১০৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। খামিছ জামাআতে পাশের হার ছিল ৮৩.৫৯%। এ সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছেন যারা এশিয়ার অন্যান্য দেশ, আফ্রিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্যীয় পরিবার থেকে এসেছেন। তাছাড়া সকল শ্রেণীতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল লক্ষণীয়।

সরকার গঠনে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে তালেবান, "থাকছে রাহবারি শুরা"

আফগানিস্তানে নতুন সরকার গঠনে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে তালেবান। ২৯ আগস্ট ভয়েস অব আমেরিকাকে এমনটা জানিয়েছেন তালেবানের এক ঊর্ধতন নেতা। তিনি জানান, তাদের দল নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যাতে সর্বোচ্চ নেতৃত্বদানকারী ফোরাম হিসেবে থাকবে "রাহবারি শুরা"। থাকবে ২৬ সদস্যের মন্ত্রিসভা। শীঘ্রই তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দাজা নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করবেন।

এর কয়েকদিন আগে তালেবানের মুখপাত্র সুহাইল শাহিন আফগান বার্তা সংস্থা শাফাকনাকে জানিয়েছিলেন, আফগানিস্তানের বিখ্যাত সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সকল আফগান পক্ষকে নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য ইসলামী সরকার গঠন করবে তালেবান। তিনি আরও জানান, এতদিন ধরে আফগান সেনাবাহিনী ও পুলিশসহ সব নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত যে কেউ তার অস্ত্র সমর্পণ করে তালেবানে যোগ দেবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

গাজায় আবারও বিমান হামলা, সীমান্ত সংঘর্ষে ৪১ ফিলিস্তিনি আহত

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে বর্বর ইয়াহুদীবাদী ইসরায়েল। গত ২১ আগস্ট গভীর রাতে এ হামলা চালানো হয়। এর আগে গাজা সীমান্তে গোলাগুলিতে এক ইসরায়েলি সেনা ও ৪১ ফিলিস্তিনী আহত হয়। এরপর রাতে বিমান হামলার ঘটনা ঘটে। রবিবার (২২ আগস্ট) এসব জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

সংবাদ মাধ্যম ভয়েজ অব আমেরিকা জানায়, শনিবার গাজা'র শাসক দল হামাস আয়োজিত বিক্ষোভে শত শত ফিলিস্তিনি অংশ গ্রহণের সময় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। তারা ইসরায়েল কর্তৃক তাদের এলাকার কঠোর অবরোধের প্রতিবাদ জানাতে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন। এসময় কয়েক ডজন প্রতিবাদকারী সুরক্ষিত সীমান্ত বেড়ার দিকে অগ্রসর হলে বিক্ষোভ আরো সহিংস হয়ে ওঠে। তারা ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করছিলো, আর এর পেছনে আগুনে পোড়া টায়ার থেকে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আহত ৪১ ফিলিস্তিনীর মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এদের মধ্যে মাথায় গুলি লাগা এক ১৩ বছরের কিশোরও আছে। এছাড়া অন্যান্যদের আঘাতের অধিকাংশই মাঝারি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে ইসরায়েল ও গাজার মধ্যে সংঘাত চরম রূপ ধারণ করেছিল। ১১ দিনের ওই সংঘাতে অন্তত ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। আর ইসরায়েলের পক্ষে নিহত হয় ১৩ জন। পরে যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে ওই সংঘাত থামে।

মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব

মালয়েশিয়ার নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশটির সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুবকে নিয়োগ দিয়েছেন মালয়েশিয়ার রাজা আল সুলতান আবদুল্লাহ। গত ২০ আগস্ট শুক্রবার তাকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ২১ আগস্ট তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ইসমাইল সাবরি, মহিউদ্দিন ইয়াসিনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। যিনি জোটের ভেতরে কোন্দলের কারণে ১৬ আগস্ট সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর পদত্যাগ করেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে জানানো হয়েছে, ইসমাইল সাবরি সংসদে ২২২টি আসনের মধ্যে ১১৪ জনের সমর্থন পেয়ে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন।

এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাজা আশা করেন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় অবিলম্বে রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটবে এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাকে পাশ কাটিয়ে সকল আইন প্রণেতা একত্রিত হবেন।

ইসমাইল সাবরির এই নিয়োগ, দেশটির পুরাতন বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইউএমএনও (ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন) কে আবারও ক্ষমতায় এনেছে। সরকারি তহবিল থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ কেলেঙ্কারির কারণে ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই দলটি ভোটে পরাস্ত হয়।

কুকুর ও বিড়ালের জন্য আফগানিস্তানে ব্রিটেনের বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত

কুকুর-বিড়ালসহ প্রায় ১৪০টি প্রাণীকে সরিয়ে আনতে আফগানিস্তানে বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন। এর আগে তালেবানদের হাতে কাবুল দখল হয়ে যাওয়ার পর নিজ দেশের নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নিতে দফায় দফায় সেনা ও বিমান পাঠিয়েছিল দেশটি।

জানা গেছে, আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যাবত পশু সেবামূলক দাতব্য সংগঠন পরিচালনা করে আসছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য পল ফার্থলিং। সেখানে শতাধিক কুকুর, বিড়াল ও গাধাসহ স্টাফদের নিয়ে কাজ করতেন তিনি। সম্প্রতি তালেবানদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পল। তাই নিজের প্রাণী ও স্টাফদের উদ্ধারে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানান তিনি।

ফার্থলিংয়ের পক্ষে প্রচারণা চালানো ডমিনিক ডায়ার বার্তা সংস্থা পিএ'কে জানিয়েছেন, তাদের এ কাজে ব্রিটিশ সরকার, বিশেষ করে দেশটির পরিবেশমন্ত্রী সরাসরি সহযোগিতা করছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এক ধনী ব্যক্তি এ মিশনে অর্থায়ন করছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তুরস্কে ৪৭ প্রদেশে ভয়াবহ দাবানল : ১২ দিন পর স্বস্তির বৃষ্টি

তুরস্কে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির ৪৭ প্রদেশে। টানা ১২ দিনের এ দাবনল আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দেশের সর্বত্র। তবে আশার কথা হচ্ছে, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হঠাৎ তুমুল বৃষ্টিতে নিভতে শুরু করেছে বেশিরভাগ বনাঞ্চলের আগুন।

তুরস্কের কৃষি ও বনমন্ত্রী বাকির পাকদেমিরলি এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, তুরস্কের মোট ৪৭টি প্রদেশে ২৪০টি দাবানলের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশের মিলাস ও কোয়জেয়িজ ছাড়া বাকি সব দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বাকি থাকা এই দুইটি দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দমকল কর্মীরা অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে গত ২৮ জুলাই দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের আনতালিয়া প্রদেশে থেকে দাবানল শুরু হয়। ২৮ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ১৩ দিনের দাবানলে দেশটিতে মোট আটজনের প্রাণহানী হয়েছে। তুরস্কে দাবানলের আগুন নেভাতে আজারবাইজান, ইরান, কাজাখাস্তান, রাশিয়া ও ইউক্রেনসহ বিভিন্ন দেশ সহায়ক সরঞ্জাম ও লোকবল দিয়ে সহায়তা করেছে।

এদিকে বৃষ্টিতে দাবানল উপদ্রুত কমতে শুরু করলে তুরস্কের সাধারণ মানুষের রাস্তায় দুআ ও শোকর আদায়ের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায় তুর্কি জনসাধারণ বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় বেরিয়ে দুআ ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছেন।

জানার আছে অনেক কিছু

ঐতিহাসিক স্থাপত্যে নির্মিত ৪০০ বছরের পুরনো বরুণা মসজিদ

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৫নং কালাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি বরুণা গ্রামে অবস্থিত আনুমানিক ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বরুণা বড় জামে মসজিদ। মসজিদটির স্থাপনা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও এলাকার

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মসজিদটি সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ- ১০০০ বাংলা মুতাবেক ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে (উক্ত সন মসজিদের প্রধান ফটকে লেখা রয়েছে) মসজিদটি স্থাপিত হয়। প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমির ওপর নির্মিত মসজিদের চার কোণায় বিরাটাকায় ৪টি ও বারান্দায় ৮টি পিলার এবং মসজিদের উপরে ৩টি দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ফুট, প্রস্থ প্রায় ৭০ফুট দেয়াল ৪ফুট প্রস্থ। মসজিদে প্রবেশের জন্য ৩টি দরজা ও উভয় পাশে ২টি জানালা রয়েছে। মসজিদটিতে প্রায় ৭০০জন মুসল্লী একসাথে নামায আদায় করতে পারেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মসজিদটির নির্মাণশৈলী ও অবকাঠামো নির্মাণে পোড়ামাটি, চুন, ইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- মসজিদটি নির্মাণে কোন রড ব্যবহার করা হয় নি!

বিগত ২০১৬ সালে মসজিদের প্রবেশপথে মসজিদ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫০ফুট দৈর্ঘ্য দৃষ্টিনন্দন মিনার নির্মাণ করা হয়। মসজিদের চারপাশে সবুজ গাছগাছালি এবং বিভিন্নরকমের ফলফলাদির গাছপালায় ভরপুর। মসজিদের সম্মুখে রয়েছে বিরাটাকায় কেন্দ্রীয় শাহী ঈদগাহ। যেখানে একসাথে প্রায় ২-৩ হাজার মুসল্লী ঈদের নামায আদায় করতে পারেন। এছাড়াও মসজিদের পেছনে ঐতিহাসিক স্থাপনায় রয়েছে সানদার পুকুর ঘাট।

স্থানীয় বয়োবৃদ্ধরা বলেন, মসজিদটি কখন, কবে স্থাপিত হয়েছে এ বিষয়ে আমরা কিংবা আমাদের পূর্বসূরি কেউই জ্ঞাত নন। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রতি রামাদানে এশিয়া মহাদেশের বরেণ্য বুযুর্গ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর হাতে গড়া কিরাত প্রশিক্ষণ সেন্টার–দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রায় ৫'শত শিক্ষার্থীদের কুরআনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়াও বরুণার পীর শাইখ লুৎফুর রহমান হামিদী (র.) সহ সিলেটের বরেণ্য আলিমরা এখানে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এবং পথহারা মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। এলাকার তরুণ এক আলিম জানান, মসজিদটি স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে আজ অবধি সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু অনেকেই ধারণা করেন মসজিদটি গাইবী। তবে এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। সরকারি তত্ত্বাবধানে মসজিদটির স্থাপত্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি এর সঠিক তথ্য উদঘাটন করা যায়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ঐতিহাসিক এই মসজিদের সঠিক তথ্য জানবে বলে বিশ্বাস রাখি।

এছাড়াও মসজিদের পশ্চিমাংশ থেকে পড়ন্ত বিকেলে বরুণা অঞ্চলের হাইল হাওর ও সূর্যাস্তের সুভা-সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। যা উপভোগ করতে স্থানীয় লোকজন প্রতিনিয়ত এখানে এসে ভীড় জমান।

- মুস্তাকিম আল মুনতাজ

মশা

বাংলাদেশ মশা উৎপাদনের জন্য অন্যতম একটি জায়গা। প্রতিবছর এসব মশা হাজারো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। মশা সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? আসুন, দেখে নেওয়া যাক-

- কারো হাতে মৃত্যু না হলে মশা সাধারণত ৫-৬ মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। আর এসব মশা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, জিকা, ডেঙ্গুসহ নানা রোগ ছড়িয়ে পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।
- সাধারণত নারী মশা রক্তপান করে। সন্তান ধারণের প্রয়োজনেই তাদের রক্তপান করতে হয়। পুরুষ মশা রক্তপান করেনা এবং রোগ বিস্তারের কারণও হয়না। তবে তারা চারিদিকে আওয়াজ করে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, যাতে সঙ্গীনী আপনাকে নির্বিঘ্নে কামড়াতে পারে।
- প্রজাতিভেদে মশার ৫-৮টি চোখ এবং ৬-৮টি পা থাকে।
- একটি পূর্ণাঙ্গ নারী মশা তার জীবনচক্রে ২০০ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত ডিম দিতে পারে।
- কানের কাছে মশার পুঁওওও আওয়াজ শুনেছেন? এসব মশার ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ। মশা সেকেন্ডে ৩০০-৬০০ বার ডানা ঝাপ্টায় এবং এই ঝাপ্টানোর মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়।
- খালি চোখে মশার তীব্র গতি দেখা গেলেও বাস্তবে মশার গতি অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কম। সাধারণত ঘন্টায় ১ মাইলের মতো দূরত্ব তারা অতিক্রম করতে পারে।
- পৃথিবীতে মশার প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ২০০ প্রজাতির মশা মানুষকে কামড়াতে পারে। অন্যরা গভীর বনে থাকা ফুলের পরাগ খেয়ে জীবনধারণ করে।
- ডিম থেকে বের হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে একটি মশা মানুষের রক্ত পানের উপযোগী হয়ে ওঠে। এসব ছোট্ট মশা মানুষকে এমনভাবে কামড়ায়, যাতে মানুষের চোখ তাকে ঠাওর করতে না পারে।
- অনেক মানুষের মধ্যে কেউ একজনকে মশা একটু বেশিই কামড়াচ্ছে? অতিরিক্ত ঘামলে, নিয়মিত গোসল না করলে, শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে মশা তাদের চিহ্নিত করে বিশেষ 'যত্ন' নেয়!
- মশার কামড় থেকে রেহাই পেতে চান? বাড়ির কোন স্থানের অল্প পানি দীর্ঘদিন জমে থাকলে অথবা ঘরের কাছে থাকা ঝোপঝাড় অল্পদিন পরপর পরিষ্কার রাখলে মশার আক্রমণ থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া সম্ভব।

সংকলনেঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

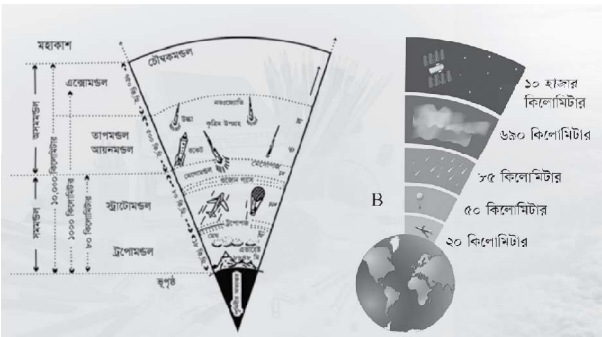

ক্যারিয়ার

ভূগোল ঃ বায়ুমণ্ডল

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য উপযোগী করে ক্যারিয়ার পাতাটি সাজানো হয়েছে। এ সংখ্যায় থাকছে বায়ুমণ্ডলের আদ্যোপান্ত। যেকোন চাকরি পরীক্ষায় বিজ্ঞান এবং ভূগোল উভয় বিষয়ের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বায়ুমণ্ডল অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। সাম্প্রতিক চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নগুলোতে দুর্যোগ, আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত প্রশ্নের আধিক্য লক্ষণীয়। এসব বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পেতে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

বায়ুমণ্ডল

মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা গ্যাসীয় আবরণই বায়ুমণ্ডল। এর বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই না থাকায় বায়ুমণ্ডলকে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি। তবে বায়ুমণ্ডলের ৯৭% উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন- বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা ও কণিকা। নানা প্রকার গ্যাস ও বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান দুটি উপাদান হল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	৭৮.০২
অক্সিজেন	২০.৭১
আরগন	০.৮০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
মোট	১০০.০০

বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য

১. বায়ু উষ্ণ হলে প্রসারিত ও হালকা হয়। শীতল হলে সংকুচিত ও ভারী হয়।
২. শীতল বায়ুর চেয়ে উষ্ণ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বেশি।
৩. বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
৪. বায়ুর চাপ হঠাৎ কমে গেলে বায়ু প্রসারিত, হালকা ও শীতল হয়ে পড়ে।
৫. ধূলিকণাপূর্ণ বায়ুর তাপধারণ ক্ষমতা বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা অনেক বেশি।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে চারটি প্রধান ও একটি অপ্রধান স্তর সহ মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা- ট্রাপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল, এক্সোমণ্ডল (অপ্রধান স্তর)। বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, বরং পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের মত মরুময় হত।

ট্রাপোমণ্ডল

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর যা ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৬-১৯ কি. মি. এবং মেরু অঞ্চলে ৮ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। এই স্তরের নিচের দিকে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে। ধূলিকণার অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের শতকরা ৭৫ভাগ এই স্তর বহন করে।

ট্রাপোমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে, বাতাসের গতিবেগ বাড়ে এবং উষ্ণতা কমতে থাকে। সাধারণভাবে প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। যে উচ্চতায় পৌঁছালে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয় সে অঞ্চলকে বলা হয় ট্রাপোবিরতি। ট্রাপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের নাম ট্রাপোবিরতি। এখানে তাপমাত্রা- ৫৪° এর নিচে হতে পারে।

স্ট্রাটোমন্ডল

ট্রাপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কি.মি. পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। এই স্তরে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোন জলীয়বাষ্প থাকে না। তাই আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুষ্ক। এজন্য এই স্তরের মধ্য দিয়ে জেট বিমানগুলো চলাচল করে। এই স্তরেই ওজোন গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে রয়েছে যা সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয়। স্ট্রাটোমণ্ডলের উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে ৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রায় ৫০ কি.মি. উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পাওয়া শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত বা স্ট্রাটোবিরতি।

মেসোমণ্ডল

স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরে এসে পুড়ে যায়। ট্রাপোমণ্ডলের মতই এই স্তরে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা কমতে থাকে যা- ৮০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। মেসোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে। এই স্তরের উপরে যে অঞ্চলে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায় সে অঞ্চলকে মেসোবিরতি বলে।

তাপমণ্ডল

মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে। এই স্তরে তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০° সেলসিয়াসে পৌছায়। এই স্তরের বায়ু অত্যন্ত হালকা এবং চাপ ক্ষীণ। তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল বলে। আয়নমণ্ডলে বেতারতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়।

এক্সোমণ্ডল

তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কি.মি. যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে। এটি ক্রমান্বয়ে ইন্টারপ্লানারি স্পেসে প্রবেশ করে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

কবিতা

উমর ফারুক

কাজী নজরুল ইসলাম

তিমির রাত্রি–'এশা'র আজান শুনি দূর মসজিদে
প্রিয়া-হারা কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি– জানে না মুয়াজ্জিন!
তকবির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই– উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী?
ও-আজানা ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারই সে আহবান?
আবার লুটায়ে পড়ি!
'সেদিন গিয়াছে'– শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি!
উমর! ফারুক! আখেরি নবির ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহবান নয়– রূপ ধরে এসো!– গ্রাসে অন্ধতা-রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি আজ তার দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া– জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এসো তুমি সেই শমশের ধরি,
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জমানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ !
মোরা 'আসহাব-কাহাফের' মতো দিবানিশি দিই ঘুম,
'এশা'র আজান কেঁদে যায় শুধু– নিঃঝুম নিঃঝুম!
...
ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণিরে,
কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবিরে,–
তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সেসব জিজ্ঞাসার!
কী যে ইসলাম, হয়তো বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন!
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি তারই শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জর সন্তানে ধরি বক্ষে শান্তিহীন!
তপস্বিনীর মতো
তাহারই আশায় সেধেছে ধরণি অশেষ দুখের ব্রত।
ইসলাম– সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি– কেন কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর–
"মোর পরে যদি নবি হত কেউ, হত সে এক উমর!"
...
অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি
খেঁজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুঠির, তুমি পড়নিকো নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা– পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!
শত প্রলোভন বিলাস বাসন ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমিছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে!
...
ভৃত্য দম্ভ চুমি
কাঁদিয়া কহিল "উমর! কেমনে এ আদেশ করো তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি"
খলিফা হাসিয়া বলে,
"তুমি জিতে গিয়ে বড়ো হতে চাও, ভাই রে এমনই ছলে!
রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে "উমর! ওরে,
করেনি খলিফা মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে!"
কী দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের,– মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড়ো ক্ষুদ্র কেবা!
ভৃত্য চড়িল উটের পিঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কি না,
কী গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি বিশ্ববাণী!
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব,–
অনাগত কাল গিয়েছিল শুধু, "জয় জয় হে মানব!"...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি–
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সেই উমর নাকি?"
খুলিল রুদ্ধ দূর্গা-দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল– "খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালমে!"
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু-গির্জা-ঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এইবার নামাজ তরে!"
কহে পুরোহিত, "আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায়?"

হাসিয়া বলিলেন, "তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ নামাজ আদায় করি,
তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ ভাবিবে– খলিফা করেছে ইশারা
হেথায় নামাজ পড়ি
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি!
ইসলামের এ নহেকো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারও মন্দির গির্জারে করে মজিদ মুসলমান!"
কেঁদে কহে যত ইসাই ইহুদি অশ্রু সিক্ত আঁখি–

"এই যদি হয় ইসলাম– তবে কেহ রহিবেনা বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!"
তুমি নির্ভীক এ খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয় সত্যব্রত তোমায়
তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষরই অপমান তাই মহাবীর
খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান
সিপাহ-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।
ধরাধাম ছাড়ি শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খালিফা– হয়নি তখনও কলহের অবসান,
নব-নন্দনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া
সবে করিতে লাগিল জটলা– ইহার পরে কে খালিফা হবে!

বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে বলিতে পারিয়াছিলে–
"নবিসূতা! তবে মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে!"
মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা– সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিণী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূণ্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়!
শুনিয়া সকল– কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বয়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে, "এসব চাপাইয়া দাও আর পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।"
কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, "বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বলো আমার পাপের ভার?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে,
আজই তার প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি!"–
চলিলে নিশীথ রাতে পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে–
খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলই প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!
...হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই,
তাই তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!
বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া ওঠে না
ঊর্ধ্বে,
বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...
...
মাহিনা মোহররম–
হাসেন হোসেন হয়েছে শহিদ, জানে শুধু হায় কৌম,
শহিদি বাদশা! মোহররমে যে তুমিও গিয়াছ চলি
খুনের দরিয়া সাঁতারি– এজাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি!
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলনি!
আজও আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারই কাঁদন বাজে
বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমের আজও ও গোরের বুকে
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়তো কত না গভীর দুখে!
ফিরদৌস হতে ডাকিছে বৃথাই নবি পয়গম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির পর!
হে শহিদ! বীর! এই দোয়া কর আরশের পায়া ধরি–
তোমারই মতন মরি যান হেসে খুনের সেহেরা পরি।
মৃত্যুর হতে মরিতে চাহি না,
মানুষের প্রিয় করে আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস
পড়ে!

[ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ২৩ হিজরীতে অগ্নি উপাসক আবূ লুলুর বিষাক্ত খঞ্জরের আঘাতে শাহাদাতবরণ করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'উমর ফারুক' কবিতায় এ মহা খলিফার জীবনের বিশেষ কিছু সময়কে চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন -বিভাগীয় সম্পাদক]

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT

SADAQAH PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands www.facebook.com/latifihands www.latifihands.org.uk

দুই কিশোর সাহাবীর সাহসিকতা

আবূ দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া

আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যারা হরদম কষ্ট দিত, তাদের মধ্যে কুখ্যাত আবূ জাহল অন্যতম। প্রতিদিন সে কথায় হোক, কাজে হোক যেকোনোভাবেই হোক কিছু কষ্ট না দিয়ে ছাড়তো না। একদিন প্রিয় নবী নামাযের মধ্যে সিজদাহ দিচ্ছেন, আবূ জাহল তখনই এসে তাঁর পিঠে এক মস্তবড় উটের ভূঁড়ি চাপিয়ে দিলো। নবীজির পিঠ ভূঁড়িটির চাপে নুয়ে গেছে। খুব কষ্ট করেও তিনি উঠতে পারছেন না সিজদাহ থেকে। নবীজির আদরের ছোট মেয়ে ফাতিমা দৌড়ে এসে পিঠ থেকে ভূঁড়িটি সরালেন। আর কেঁদে কেঁদে খুব বকা দিলেন আবূ জাহলকে। এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিল না। কারণ তারা যে কাফির বদমাশদের হাতে অসহায়!

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেলেন। সেখানের মানুষ সাদরে গ্রহণ করেন নবীজি ও তাঁর সাহাবীদেরকে। প্রিয়নবীর ওপর কাফিরদের অত্যাচারের দুঃখজনক কাহিনী শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই শুনে আবেগে অশ্রু ঝরালেন। সেই আসরে মুআয ও মুআওয়িয নামের দুই কিশোরও ছিলেন। তাঁরা আপন দুই ভাই। তাঁরা আবূ জাহলের কথা শুনে রাগে কতক্ষণ দাঁত কটমটালেন। পরে দু'ভাই একে অপরের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করলেন তারা আবূ জাহলকে পেলে হয় মারবেন, না হয় নিজের জান দেবেন। আস্ত ছাড়বেন না। পরে হয়েছিলও তাই।

দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার কাফির দুশমনদের সাথে মদীনার মুসলমানদের তুমুল লড়াই হয়। বদর নামের মাঠে হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে বদর যুদ্ধ বলে। মক্কার সেই বাহিনীতে কাফিরদের সকল বড় বড় নেতারা ছিল। এর মধ্যে আবূ জাহল ছিল সবার বড় নেতা।

তুমুল লড়াই চলছে। সেই কিশোর দুই ভাই মুআয আর মুআওয়িযও যুদ্ধ করছেন বড়দের মতোই। অনেক কাফির দুশমনদের মাথা তাঁদের তলোয়ারের আঘাতে কাটা পড়লো। কিন্তু মক্কার সেই আবূ জাহলকে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। আবূ জাহলকে তারা চিনেনও না। তাঁরা ছুটে গেলেন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এর কাছে। তাঁকে পেয়েই তাঁরা বললেন, আবূ জাহলকে আমাদের চিনিয়ে দিন। তিনি বললেন, কেন বাবা? ওকে দিয়ে তোমাদের কী দরকার? তাঁরা বললেন, আমরা তাকে হত্যা করব। তিনি বললেন, সর্বনাশ! সে তো মারাত্মক হিংস্র লোক! অনেক বড় যোদ্ধা। তার সাথে তোমরা পারবে না বাছারা। কিন্তু তারা দুজন নাছোড়বান্দা। এরই মধ্যে আবূ জাহল তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি শুধু আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে, এটাই আবূ জাহল। আর অমনি তাঁরা তীর বেগে বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন আবূ জাহলের ওপর। প্রথমেই তাঁদের একজন আবূ জাহলের ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। ফলে সে ঘোড়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর যায় কোথায়। একের পর এক আঘাত করতে লাগলেন দুই ভাই মিলে। আবূ জাহল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। লুটে পড়লো মাটিতে। কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়, যখন বুঝলেন আবূ জাহল আর বেঁচে নেই তখনই রেহাই দিলেন।

এদিকে আবূ জাহলের ছেলে ইকরামা পেছন দিক থেকে এসে মুআযের বাম বাহুতে তলোয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করে। সাথে সাথে হাতটি কেটে ঝুলে যায়। মুআয ঘুরে ইকরামাকে আক্রমণ করলে সে পালিয়ে বাঁচলো। মুআয আবার বীরদর্পে যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু কাটা হাতটি সামান্য চামড়ার সাথে ঝুলে থাকায় যুদ্ধে অসুবিধা হচ্ছে দেখে হাতটি পায়ের নিচে রেখে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। ব্যস, লড়াইয়ে আবার মন দিলেন মুআয।

পরশ পাথর

মুহাম্মাদ উসমান গণি

গভীর রাত। আকাশের তারকাগুলো মিটিমিটি আলো ছড়াচ্ছে। জনমানবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। নিঝুম নিরালায় সবকিছু আশ্রয় নিয়েছে ঘুমের কোলে। রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা তবে গুটগুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারময় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.)। হাটছেন তো হাটছেনই, কোথায় গিয়ে থামবে হাটার গতি এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন! বহু দূরে নিভুনিভু একটি মশাল দেখা যাচ্ছে। কে হবে এ মশালধারী? হয়তো কোনো বেদুঈন পথিক বিপদে পড়ে আছে সেখানে। এক পা দু'পা করে এগুতে লাগলেন মশালকে লক্ষ্য করে। পৌঁছে গেলেন মশালের পাশে। একটা তাবু দেখতে পেলেন। তাবুর কাছে পৌঁছা মাত্রই দেখলেন একটা লোক তাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তাবুর ভেতর থেকে শুনা যাচ্ছে করুণ আর্তনাদ। লোকটাকে সালাম দিয়ে আমিরুল মুমিনীনের জিজ্ঞাসা, ভাই তুমি কোথা হতে এসেছো? আর যাবেই বা কোথায়? লোকটা জবাব দেয় আমি এক মুসাফির, খলীফার কাছে যাচ্ছি কিছু সাহায্যের জন্য। কিন্তু খলীফা তো আমাদের একটু খবরও নেননি?

উমর (রা.) আবারও প্রশ্ন করেন, ভাই তোমার তাবুর ভেতর হতে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে একটু বলবে কি কার কান্নার শব্দ?

লোকটা জবাব দেয়, ভাই তুমি যে কাজে এসেছো সে কাজে চলে যাও, এতো কিছু জানার কী প্রয়োজন তোমার? আর জানলেই বা কী করতে পারবে তুমি? হযরত উমর (রা.) বিনয়ের সাথে বললেন, একটু বল না ভাই! উমর (রা.) এর পীড়াপীড়িতে লোকটা জানায় আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। বেদনায় অস্থির হয়ে আর্তনাদ করছে। উমর (রা.) এর জিজ্ঞাসা, তোমার তাবুতে কি কোন ধাত্রী আছে? লোকটির জবাব, না আমার স্ত্রী একাই।

হযরত উমর (রা.) তড়িত চলে আসেন বাড়িতে। স্বীয় পত্নী উম্মে কুলসুমকে ডেকে বললেন, আজ তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পূণ্যের কাজ উপস্থিত। উমর (রা.) তাবুর ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে বললেন, সন্তান প্রসবের সময় যা যা প্রয়োজন তা নিয়ে নাও এবং একটি পাতিল ও কিছু আটা সাথে নাও। হযরত উমর পত্নীসহ চললেন তাবুর দিকে। তাবুতে পৌঁছার সাথে সাথে উম্মে কুলসুম ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অন্যদিকে স্বয়ং খলীফা আগুন জ্বালিয়ে আটা দ্বারা রুটি পাকাতে লাগলেন। ক্ষণিক পরে তাবু হতে উম্মে কুলসুম এসে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে ছেলে হওয়ার সুসংবাদ দিন। আমিরুল মুমিনীন শব্দ শুনে বেদুঈন লোকের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবে হায় হায়! আমি স্বয়ং খলীফার সাথে এরূপ আচরণ করলাম?

খলীফা বুঝতে পেরে হাসিমুখে বললেন, তুমি অস্থির হইওনা ভাই। বরং আমার দূর্বলতার কারণেই তুমি এতো কষ্ট পেলে। আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি সমস্ত রাত জাগরণ করেছো, এবার নিজে খাও এবং প্রসূতিকেও আহার করাও। আগামীকাল তুমি আমার নিকট এসো, বাইতুল মাল থেকে তোমার ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। লোকটা অভিভুত হয়ে যায় খলীফার আচরণ দেখে। কোনো মানুষের কি এরূপ ব্যবহার হতে পারে? একজন রাষ্ট্রপ্রধানের এমন নম্রতা ও কোমলতা দেখে বেদুঈন ব্যক্তিটি ইসলামের প্রতি দূর্বল হয়ে পড়ে। লোকটির মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ইসলামই কি একজন রাষ্ট্র প্রধানকে এতো বিনয়ী করে তুলেছে? সত্যিই ইসলাম একটা পরশ পাথর। লোকটা সে পরশে মাথা নত করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠ করে স্ত্রীসহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাইতো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

ইসলাম সে তো পরশ মানিক কে পেয়েছে তারে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

আমার শিক্ষায় হাতেখড়ি

গোলাম সারওয়ার
কলাম লেখক, সিলেট

ঘাগটিয়া গ্রাম, জাদুকাটা নদীর পাড়ে সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ গ্রাম। জন্মেই ওখানে একটা স্কুল পাই। যেখানে আমার শিক্ষায় হাতে খড়ি। স্কুলটি এখনও আছে। তবে অনলাইন দৌরাত্মে ভবিষ্যতে থাকবে কি-না জানি না। খুব সম্ভব ১৯৬৯ সালের দিকে আমার শিক্ষায় প্রথম পাঠ শুরু হয়। দেশ স্বাধীনের পর আমি অটো প্রমোশনে ক্লাস ফোরে উঠি।

আমার প্রথম বই ছিল 'সবুজ সাথী'। বইটির ঘ্রাণ এখনও আমি ভুলতে পারি না। সুন্দর সুন্দর ছড়া, কবিতা এবং গদ্যে সমৃদ্ধ ছিল বইটি। বাক বাকুম পায়রা, মাথায় ছিল টায়রা– স্বাধীনতা পরবর্তী সংস্করণে হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং থেকেও যে শব্দচয়ন, অর্থ বা ছন্দের সংমিশ্রণ সমাদৃত ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিংবা গণি মিয়া একজন কৃষক গল্পে যে শিক্ষাটা আমরা পাই, এখনকার বইগুলোতে তা অনুপস্থিত। একটা কথা মনে পড়ল আজ বৃষ্টির দিন। গ্রামীণ জনপদের দৃশ্যটাই থাকে আলাদা। কাঁচা সড়ক দিয়ে স্কুলে আসার পথে একটা ডোবা ছিল। সেই ডোবাটি বৃষ্টির পানিতে ভরে গেল। স্কুলে না গিয়ে আমরা সাঁতার কাটা শুরু করে দিলাম। সাঁতার কাটার জন্য স্কুলে যাইনি আমরা কয়জন। পবিত্র স্যার, আমাদের প্রিয় শিক্ষকদের একজন। এখনও স্যারের সাথে যোগাযোগ আছে, ফোনে আলাপ হয়। স্যার এ পথ ধরেই স্কুলে আসছিলেন। স্যারকে দেখে আমি পাড়ে দাঁড়ালাম, যদিও সে সময় সবাই দিগম্বর ছিলাম। বাকীরা সব পানি ছিটিয়ে সাতরাচ্ছিল। ডোবার উপর সাঁকো ছিল না। ফলে স্যার কোনো মতে ডোবার কিনার ঘেষে চলে গেলেন। পরের দিন স্কুলে ঠ্যালা সামলানোর অবস্থা। আমি ছাড়া বাকী সব 'বেতের বাড়ি' খেল। আজও সেই স্কুল আছে সবই আছে কিন্তু নেই অনুভূতিগুলো। অনুভূতিতে ভেসে আজও চলে যেতে ইচ্ছা হয় সেই শৈশবে।

সৈয়দা কারিমা সুলতানা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,সিলেট

বেশিরভাগ মানুষের শিক্ষাজীবন যেভাবে শুরু হয় আমারও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। মা-বাবার হাত ধরেই পড়ালেখা শুরু। খুব ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি আমার অনেক কৌতুহল কাজ করতো। আমাদের ছোটবেলায় আমরা কোনো ধরনের প্রযুক্তির সাথে পরিচিত ছিলাম না। তখনকার সময়ে খাতা পেন্সিলের চেয়ে শ্লেটের প্রচলনটাই বেশি ছিলো। বাবা আমাকে আদর্শলিপি নামে একটি বই, কালো একটি শ্লেট আর এক বাক্স চক এনে দিয়েছিলেন। সেদিন এইগুলো দেখে যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম! তা বর্ণনাতীত। শ্লেটে লিখতে গিয়ে বর্ণের সাথে যুদ্ধ করতে করতে চক ভেঙেছে বহুবার। চকের গুড়ো লেগে কাপড়-চোপড়, হাত-মুখ সাদা হয়ে যাওয়ার কথা নাই বললাম। কী মধুর ছিলো সেই স্মৃতিগুলো! সন্ধ্যা হলেই বই নিয়ে পড়তে বসা, আবার ভোরবেলা হুজুরের কাছে আরবী পড়তে যাওয়া। অনেক নিয়মের মধ্যে কেটেছে দিনগুলো। বাবা ছিলেন খুব ব্যস্ত মানুষ, যা প্রায় সকল বাবারাই হয়ে থাকেন। বাবা চাকরির জন্য খুব একটা সময় দিতে পারতেন না । সে হিসেবে মা-ই আমার জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। বইয়ের পাশাপাশি মা নৈতিক শিক্ষাগুলোও শিখাতেন হাতে-কলমে। যা আজও আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে। এখনও মনে আছে প্রথমদিনের স্কুলে যাওয়ার স্মৃতি, প্রধান শিক্ষক আমাকে ডান হাত দিয়ে বাম কান স্পর্শ করতে বলছিলেন যেটা ছিলো স্কুলে ভর্তি হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি পরীক্ষা। সেই কঠিন পরীক্ষায় কোনোরকম উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম স্কুলে। যা আজও মনে পড়লে চরম হাসি পায়। প্রথমদিকে শিক্ষকদের দেখে অনেকটা ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ভালো লাগতো সবকিছু। স্যারদের সাথে অনেক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে যায় আমাদের সবার। এখন হয়তো অনেক ভালো প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছি কিন্তু ছোটবেলার সেই সময়টুকু এখনো প্রায়ই মনে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে এইদিনগুলো এখন শুধুই স্মৃতি, চাইলেই ফিরে পাবো না মধুর সময়গুলো।

মুফতি কামাল হোসাইন ফরায়েজী
নায়েবে মুহতামীম, নূরে মদীনা মহিলা মাদরাসা, কাপাসিয়া, গাজীপুর

সম্ভবত ১৯৯৪ সাল। আমিসহ প্রতিবেশীর অন্যান্যরা মক্তবের হুজুরের নিকট বাংলা বর্ণমালা, ইংরেজি অক্ষর ও আরবী হরফসমূহের সাথে পরিচিত হই। ৯৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হই। তখনকার গ্রাম্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অবহেলিত। তাই স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও গৃহ শিক্ষকদের কড়া মেজাজ,ধমক, বেত্রাঘাত ও তুখোড় শাসনের মাত্রার ফলে নিজেদের মনে সর্বদা ভয়-ভীতি এবং আতংক বিরাজ করত । এসকল কারণে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, গৃহশিক্ষকের পড়ার ক্লাসে অনুপস্থিত হওয়াই যেন স্বস্তির বিষয় ছিল। তাই পড়ার সময়ের পূর্বক্ষণে অসুস্থতার ভান করা, কোথাও লুকিয়ে যাওয়া, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া বা পরিবারের কোন কাজে জড়িয়ে পড়া ছিল নিত্যদিনের স্বাভাবিক বিষয়। তারপরও স্কুলে বা গৃহশিক্ষকের কাছে হাযির হলে সময় গুনতে থাকতাম কখন ছুটি হবে। কেননা দীর্ঘ সময় পড়াতেন এবং পড়া খুবই কঠিন মনে হত। শিখলেও ভয়-ভীতির কারণে ভুলে যেতাম সঠিকভাবে বলতে পারতামনা। হঠাৎএকদিন গৃহ শিক্ষক পরিবর্তন হলো। নতুন শিক্ষক প্রথমেই যে টেকনিকটি গ্রহণ করেছিলেন তা হলো খুব কম সময় পড়াতেন ও খেলাচ্ছলে পড়াতেন। আমাদের কাজের খুব প্রশংসা করতেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, রাত্রে অন্যান্যরা একটি বইয়ের পড়া শিখতে যতটুকু সময় লাগবে ততটুকু সময়ে কামাল তিনটি বইয়ের পড়া শিখতে পারবে। ওস্তাদজীর এমন

মন্তব্যে নিজের মধ্যে এক অন্যরকম উৎসাহ কাজ করছিল । সেদিন থেকে পড়ালেখায় এতবেশি মনোযোগ দিলাম যে, প্রতিদিন অধিক মনোযোগের সাথে পড়া শিখা ও বেশি পড়া দেওয়াই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। আমার পড়ালেখার অবস্থা দেখে বাবা মাঝেমধ্যে এসে ওস্তাদজীকে বলতেন, আমার ছেলে এতবেশি পড়লে মাথা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিন। ওস্তাদজী তাতে সম্মত হলেন কিন্তু আমি টেনশনে পড়ে গেলাম। কারণ আমি যতদিন ছুটিতে থাকবো ততদিনে আমার সাথের সবাই আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। আমি যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালাম। প্রত্যেকটি মানুষের শিক্ষার হাতেখড়ি কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা মানুষের মাধ্যমে হয়ে থাকে যার স্মৃতি সে সারাজীবন বহন করে।

আন্নামা চৌধুরী

এমসি কলেজ, সিলেট

পরিবারের বড় মেয়ে আমি, তাছাড়া আম্মু-আব্বুর বিয়ের বারো বছর পরে আমার জন্ম। সে হিসেবে সবার খুব আদর আর আহ্লাদের ছিলাম আমি। প্রায় শিশুরই শিক্ষায় হাতে খড়ি হয় মা অথবা বাবার হাতে। আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আম্মুর হাতে। স্কুলে ভর্তির আগে থেকেই আমাকে কালো স্লেটে চক দিয়ে অক্ষর শিখাতেন আম্মু। তারপরে বিভিন্ন ধরনের ছড়া শিখাতেন, শিখাতেন আরবী সূরা ও বিভিন্ন দুআ। কার সাথে কী ব্যবহার করব, কিভাবে কথা বলবো, সালাম-কালামসহ আদব-শিষ্টাচারচর্চা চলত সেই ছোট্ট বয়স থেকেই। আমার বয়স যখন চার বছর তিন মাস। তখন আম্মু আমাকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। আব্বু প্রবাসে ছিলেন, আমার পড়ালেখার দায়িত্ব চাচ্চুর উপর ছিল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার তেমন কোন স্মৃতি খেয়াল নেই, তবে বড়দের কাছে গল্প শুনেছি। স্কুলে ভর্তির পর আম্মু কালো স্লেটের পরিবর্তে পেন্সিল দিয়ে লেখানো শুরু করলেন। সেসময় আম্মু আমাকে অনেক কবিতা মুখস্থ করাতেন। সেই কবিতা রেকর্ড করা হতো আমাদের কালো বড় টেপ রেকর্ডারে, কালো ফিতা বিশিষ্ট ক্যাসেটটি পাঠানো হতো প্রবাসে থাকা আব্বুর কাছে। তখন জীবন এতো ডিজিটালাইজড ছিল না, তবে আবেগের মূল্য অনেক বেশি ছিল। আম্মুর হাত ধরে স্কুলে যেতাম, ছুটি হলে চাচ্চুর সাথে ফিরতাম বাসায়। আমার স্কুলের নাম ছিল এম.সি কলেজ শিশু বিদ্যালয়। যা ছিল এম.সি কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই। আমাদের ভালো লাগতো এই ভেবে যে স্কুলের গন্ডি পেরুনোর আগেই চলে এসেছি কলেজে।কেজি ওয়ান, টু পড়ার কোন স্মৃতি তেমন মনে নেই। প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে কিছুটা মনে আছে। উঁচু-নিচু টিলার পাদদেশে ছিল আমাদের স্কুল। কত আনন্দের ছিল সে সময়টা! প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পরে সময়ের ব্যবধানে বৃত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে আবার এম.সি কলেজে। যেখানে থেকে শুরু সেখানে এসে সমাপ্তি, সুন্দর সমীকরণ। যেখানে হয়েছিল হাতে খড়ি সেখানেই আবার শিক্ষাজীবনের ইতি।

মাওলানা মো. রায়হান উদ্দীন চৌধুরী

আরবী প্রভাষক, জিরুন্ডা মানপুর তোফাইলিয়া ফাযিল মাদরাসা, লাখাই, হবিগঞ্জ

আমার শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়েছিল আমার শ্রদ্ধেয় পিতার হাতে। আমার আব্বা ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৬১ সালে ১ম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেছিলেন। বাবা আমাকে হাতেকলমে অক্ষর শিখাতেন,মুখস্থ করাতেন। বাবার কঠিন তদারকি থাকায় অতি অল্প সময়েই আমি অক্ষরগুলো আয়ত্ত করতে সক্ষম হই। এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই। স্কুলের শিক্ষকরা যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন,যার কারণে অতি অল্প সময়েই আমি পড়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে যাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি থেকেই একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করতো। ক্লাসে সবার চেয়ে বেশি পড়া বলতে পারা, পরীক্ষায় বেশি মার্ক পাওয়া সর্বোপরি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা ছিল একমাত্র ব্রত। ক্লাসে কখনো অনুপস্থিত থাকতাম না। কারণ আমার একদিনের অনুপস্থিতির কারণে অন্যরা হয়তো আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সবসময় চেষ্টা থাকতো। কারণ স্যার-ম্যাডাম খুশি না হলে পরীক্ষায় মার্ক কম দেন সেরকম একটা বিশ্বাস তখন কাজ করতো। যাতে করে কখনো কোনো শিক্ষকের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ কখনো করিনি। আর এ কারণে শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আর এই স্নেহটাই স্কুলের প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতো। এ পর্যায়ে এসে বুঝতে পারছি শিক্ষকদের সেই উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা না থাকলে আজকে হয়তো এতটুকু পড়াশোনা করা সম্ভব হতো না। আমার সেই প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের কথা কোনো দিন ভুলবো না। তাদের জন্য মনভরে দুআ করতে ইচ্ছা হয়। সেই স্মৃতিগুলো সবসময় মনে ভেসে উঠে। সেই স্মৃতি আর স্কুলে যাওয়ার অনুভূতিগুলো আজও মনে পড়ে বারবার।

মো. মিজানুর রহমান

সফাত আলী আলিয়া মাদরাসা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

আমার দাদীর কাছ থেকে আরবী শিখার মধ্য দিয়ে আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা । তাঁর কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেছি । স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে দাদীর কাছে আদর্শ লিপি থেকে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইংরেজি বর্ণমালা, আরবি বর্ণমালা ও সংখ্যা গণনা শিখি এবং আমাকে হাতে হাত ধরে তা লিখতে শিখিয়েছেন। পরের বছর পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই । স্যার তিনটি নতুন বই দিলেন । বই নিয়ে বাড়ীতে আসলাম এবং নতুন বই পাওয়ার খুশির খবর হৈ-হুল্লোঁড় করে বাড়ীর সকলকে জানালাম । তাছাড়া সময় অসময় বই খুলে বানান করে করে পড়তাম । নিয়মিত স্কুলেও যেতাম । কারণ নিয়মিত স্কুলে না গেলে স্যার বই ফেরত নিয়ে নিবেন সে ভয়ে । তা ছাড়া আমাদের অঞ্চলে সে সময়ে বিদ্যুৎ ছিল না । তখন সকালবেলা দাদীর কাছে আরবী পড়াশুনা করতাম । আর সন্ধ্যাবেলা কেরোসিন দিয়ে জ্বালানো হারিকেন অথবা কুপিবাতি এর আলোর সাহায্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই পড়তাম । এভাবে দাদীর সাহচার্যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করলাম । পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি দাখিল মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই এবং সে বছরই আমার জীবনের প্রথম শিক্ষিক আমার দাদী আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান ।

আজও চোখ বুঝে কল্পনায় শৈশবে দাদীর সাহচার্যে কাটানো শিক্ষা জীবনের শুরুটা খুঁজে বেড়াই । বারবার দাদীর কথা মনে পড়ে । আল্লাহ যেন আমার দাদীর কবরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন ।

ঘোষণা

অনুভূতি বিভাগে আপনার স্মৃতিতে থাকা এমন কোন বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন যাতে আপনার মনে বিশেষ অনুভূতির জাগ্রত হয়েছিলো। স্মৃতিতে থাকা সুঃখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়ে অনুর্ধ ২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন যা পাঠকের মনেও সাড়া জাগাবে।

বি.দ্র. এই বিভাগে কেবল স্মৃতিচারণ নয় বরং প্রকাশ করুন মনের আবেগ অনুভূতির।

রহমতে মাওলার

পিয়ার মাহমুদ

মানুষগুলো আর কতদিন
এমনভাবে চলবে?
কারো কাছে আসতে গেলে
মহামারী বলবে?

বাঁচতে হলে শপথ করি
সবাই মিলে আজ
করব না আর যুলুমবাজি
পাপের কোনো কাজ।

দেখবে খোদা ঠিক নিয়েছেন
মহামারী তুলে
যাবে মানুষ মহামারীর
করুণ দশা ভুলে।

আগের মতো হয়ে যাবে
সবকিছু ঠিকঠাক
আসবে না আর যখন তখন
লকডাউনের ডাক।

ধনী গরীব সবাই মিলে
থাকব মহা সুখে
দৌড়ে আসার সুযোগ হবে
একে অন্যের দুঃখে।

শ্রমজীবি মানুষগুলোর
করুণ দশা আর
দেখতে হবে নাকো কভু
রহমতে মাওলার।

মুনাজাত

এস এম মনোয়ার হোসেন

কতো গুনাহ করেছি প্রভু বুঝে না বুঝে
তবু তোমার অসীম দয়া পাই সদা খুঁজে।
আগলে তুমি রাখো আমায় কত যে মায়ায়
যেদিক তাকাই পূর্ণ জীবন তোমারই দয়ায়।

জীবন তবু যাচ্ছে কেটে হেলা অবহেলায়
চলে যেতে হবে জানি বেলা অবেলায়।
ওগো প্রভু দয়াময় ক্ষমা করে দিও
প্রিয় বান্দাদের সাথে সামিল করে নিও।

তোমার রহমতের আশায় পথ চেয়ে থাকি
তোমারই বান্দা আমি তোমাকেই ডাকি।

মুহাম্মাদ ﷺ

ছাদিকুর রহমান সিরাজী

মুহাম্মাদ নামে
কতো ফুল ফুটে
পাখি গান গায়
মুহাম্মাদ নামে
কতো নদী ছুটে
মোহনা হারায়।

মুহাম্মাদ নামে
কতো জল ঝরে
নদ–নদী উত্তাল
মুহাম্মাদ নামে
কতো ঢেউ খেলে
উড়ে সাদা পাল।

মুহাম্মাদ নামে
ভোমরা নাচে
মধু থইথই
মুহাম্মাদ নামে
ফল গাছে গাছে
খুশি হইচই।

মুহাম্মাদ নামে
হয়ে যাও ফানা
যদি চাও রব
মুহাম্মাদ নামে
জান কুরবান
পিতা মাতা সব।

কবে যাবে?

হামিদ মাহমুদ

করছে না ভয় আর
করোনা ভাইরাস
হতাশ করে আজ
অবিরাম অবিরাশ।
স্বাধীন ভাবে হবে কি
এক সাথে চলা
চিন্তা করে সব জনতা
নিরবে একেলা।

পাপ করি বুঝি তাই
মহামারি ফল
তুমি ছাড়া নাই তো
আমাদের বল।
সবকিছু দাও মাফ
আল্লাহ তাআলা
রহমত দিয়ে করো
বিশ্বটা উজালা।

ছন্দে গাঁথা মর্মবাণী

(সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ১-১২)

তাজ উদ্দিন আহমদ তাজুদ

মহা প্রলয় সংঘটিত
বাণী পরম সত্য
উঁচু-নিচু প্রভেদ হবে
মিথ্যা নয় এ তথ্য।

উঠবে কেঁপে বসুন্ধরা
পাহাড় হবে চুর্ণ
ধুলিকণায় মিশে যাবে
রবে না কেউ পূর্ণ।

অগ্রগামী ডান আর বাম
তিন গ্রুপে ভিন্ন
মানব জাতির অবস্থানের
এই ভয়ানক চিহ্ন।

চির সুখী ডানের যারা
মহান রবের শর্ত
বামের যারা থাকবে পড়ে
নরক নামের গর্ত।

অগ্রগামী দলের যারা
দিদার লাভে ধন্য
স্বর্গপুরের মহা নিয়ামত
কেবল ভোগের জন্য।

কুরআনের মাহাত্ম্য

হুসাইন আহমদ

কুরআন রবের দান
হিদায়াতের তরে
হয়েছে নাযিল আমার
নবীজির উপরে।

নয় কোন কবির ভাষা
জাদুকরের বাণী
মধুরতায় পূর্ণ আমার
রবের কিতাবখানি।

যতই শুনি কাটে গ্লানি
তৃপ্তি পাই প্রাণে
মন চায় শতবার পড়ি
মুহাব্বাতের টানে।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

ইসলাম সেতো পরশ-মানিক তাকে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
-কাজী নজরুল ইসলাম

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)। যিনি ধুলার তখতে বসে শাসন করেছিলেন অর্ধ জাহান। একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়েও সাদামাটা জীবন গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অনাড়ম্বর জীবনযাপনের এই আদর্শকে ভিত্তি করে আরব থেকে শাসন ক্ষমতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আরব-আযমসহ পৃথিবীর দিকবিদিক। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন প্রজাদের দৈন্যদশা অবলোকন করতে। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) এর শাহাদাত দিবস ২৯ মহররম। আমরা সেই মুকুটবিহীন সম্রাটের উত্তরসূরি।

উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)। সেই ধারাবাহিকতায় তার উত্তরসূরিরা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এর সিলসিলার বুযুর্গদের দ্বারাই এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রয়েছে। যামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) সেই সিলসিলারই অন্যতম প্রাণপুরুষ। সহীহ আকীদা বিস্তারে যিনি দেশ-বিদেশে অসামান্য ভূমিকা রেখে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহীহ আকীদার চর্চা চলমান। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)ও ২৯ মহররম ইন্তিকাল করেন।

প্রিয় বন্ধুরা!

এ সংখ্যার অনুভূতির আয়োজন ছিল 'আমার শিক্ষায় হাতেখড়ি'। তোমাদের যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। অনেকেই লিখেছো। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকের লেখাই ছাপানো সম্ভব হয় নি। যাদের লিখা ছাপাতে পারিনি তারা কিন্তু মন খারাপ করবে না। আগামী সংখ্যার জন্য লিখতে শুরু করে দাও। লিখতে লিখতে একসময় দেখবে তুমিও পাক্কা লেখক হয়ে যাবে।

তোমাদেরকে একটা সুখবর দিচ্ছি, তোমাদের সুবিধা বিবেচনায় আগামী সংখ্যা থেকে কিন্তু অনুভূতি বিভাগে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় থাকবে না। পরওয়ানার সম্পাদক মহোদয় তোমাদের জন্য এ বিভাগটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যেকোনো বিষয়ে অনুভূতি লিখতে পারবে এ বিভাগে। লিখতে পারবে এমন সব অনুভূতি নিয়ে যা তোমার হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। যাতে রয়েছে পাঠকের জন্য শিক্ষণীয় কোনো বিশেষ বার্তা। তাহলে আর দেরি কেন। এক্ষণি কাগজকলম হাতে নিয়ে বসে পড়ো আর লিখে ফেলো তোমার স্মৃতিতে বিশেষ কোনো অনুভূতির কথা।

বন্ধুরা! আমাদের দেশে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ইতোমধ্যে এ মহামারীতে আমরা অনেক স্বজন ও আপনজনকে হারিয়েছি। আল্লাহ যেন সকলকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। অসুস্থ হয়ে আছেন আরও অনেকেই। তাদেরকে যেন আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুত সুস্থ করে দেন। আমরা যারা এখনো সুস্থভাবে বেঁচে আছি আমাদেরকে আল্লাহ যেন পূর্ণ সুস্থতায় রাখেন। তোমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে বয়স্কদের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে।

তোমরা ভালো থাকবে। সুস্থ থাকবে। আল্লাহ যেন সকলকে সুস্থতার সাথে রাখেন। সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের জন্য ইতি টানছি।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আমি এই প্রথম তোমাকে লিখলাম। আবাবীল ফৌজ আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। শব্দকল্প ও বর্ণকল্পগুলো দেখতে খুব মজা পাই, কিন্তু কীভাবে তা সমাধান করতে হয় তা আমি বুঝি না। তুমি একটু বলে দিলে খুব খুশি হতাম।

মারিয়া আক্তার
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: ওহ তাই! কোনো সমস্যা নেই। এটা এক প্রকার মজায় মজায় শেখার মতো। প্রতি সংখ্যার শব্দকল্পের সাথে সূত্র দেওয়া থাকে যা শব্দকল্পের সমাধানের ক্লু হিসেবে কাজ করে। তুমি বর্তমান সংখ্যার সাথে এর আগের সংখ্যা মিলিয়ে দেখ তোমার কাছেও খুব ইজি হয়ে যাবে বিষয়টা। একসময় তুমিও খুব সহজে মিলিয়ে ফেলতে পারবে এ মজার বিষয়টি। আর বর্ণকল্প তো আরও সহজ বিষয়। বক্সের মধ্যখানে একটিমাত্র অক্ষর বসাবে আর এলোমেলো অক্ষরগুলো ধারাবাহিক সাজিয়ে ফেললেই হয়ে যাবে অর্থবোধক চারটি শব্দ। সংখ্যাকল্পটি শুধু একটু মাথা খাটালেই দেখবে সমাধান করে ফেলেছো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! বিগত সংখ্যায় আমার লেখাগুলো আবাবীল ফৌজে প্রকাশিত হওয়ায় আমি খুবই খুশি। মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো এই আবাবিল ফৌজ, যা আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিভাকে প্রকাশ করে লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। আরেকটা জিনিস জানার আগ্রহ প্রকাশ করছি যে, শুনলাম পরওয়ানায় অতীতে " জীনতত্ত্ব" নামে একটি বিভাগ ছিল। এ বিভাগটি ইদানিং নেই। জানালে খুশি হবো।

মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার

-আন্দালিব ভাই: তোমার লেখা ছাপাতে পেরে আমরাও প্রীত হলাম। তুমি মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে পরওয়ানাকে মাধ্যম হিসেবে নিয়েছ শুনে খুশিও হলাম। আবাবীল ফৌজে তোমার নিয়মিত অংশগ্রহণকে মুবারকবাদ জানাই। তুমি দেখতে পাচ্ছ পরওয়ানায় নতুন নতুন বিভাগ চালু হয়েছে, একে একে আমরা চালু করব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আলহামদুলিল্লাহ! আগস্ট সংখ্যায় পরওয়ানার অনুভূতি বিভাগে 'আমার স্মৃতিতে মক্তব' বিষয়ে আমার লেখা প্রকাশ করায় আন্দালিব ভাইসহ পরওয়ানা পরিবারকে মুবারকবাদ জানাই। আমি এই ম্যাগাজিনের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

মো. রইছ উদ্দিন
পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: আগস্ট সংখ্যায় অনুভূতি বিভাগে তোমার লেখা ছাপা হওয়ায় তুমি আনন্দিত হয়েছো জেনে আমরাও খুশি হলাম। লেখার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি বেশি লিখতে হবে এবং যে বিভাগে লিখবে সে বিভাগের লেখাগুলো ভালোভাবে পড়ে নিবে। তখন তুমি লিখার উপাত্ত পেয়ে যাবে সহজে। আবাবীল ফৌজে নিয়মিত লিখার জন্য তোমাকে সাধুবাদ জানাই।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! এ মাসে খুব দ্রুত পরওয়ানা হাতে পেয়েছি। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। পরওয়ানা হাতে নিয়ে যখন প্রচ্ছদটা দেখলাম তখন আমার হৃদয়টা কেঁপে ওঠলো। চোখের সামনেই যেন ভেসে ওঠলো ফুরাত তীরের সেই রক্তাক্ত কারবালা। রক্তে রঞ্জিত সেই ময়দানের প্রতিচ্ছবি দেখে মনটা কেঁদে ওঠলো। মনে পড়ে গেল প্রিয়নবী ﷺ এর প্রিয় দৌহিত্র হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কথা। মনের মধ্যে ভেসে ওঠল আহলে বাইতের নির্মম সেই করুন ইতিহাস। বিষয়ের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এরকম একটা প্রচ্ছদ ডিজাইনের জন্য পরওয়ানা প্রিন্টিং বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। এ মাসে প্রকাশিত শারহুল হাদীস, ফিকহ ও আশুরা বা কারবালা সংক্রান্ত প্রবন্ধ, অনুভূতি বিভাগে প্রকাশিত মক্তবের স্মৃতি খুব ভালো লেগেছে। এতো সুন্দর সুন্দর লেখা উপহার দেওয়ার জন্য সম্মানিত লেখকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়াও গত মাসের শব্দকল্পে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাই। পরওয়ানার এরকম কার্যক্রম যেন ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে এই প্রত্যাশা করছি।

বদরুল ইসলাম
নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: দ্রুত তোমাদের হাতে পরওয়ানা পৌঁছাতে পেরে আমাদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে। আগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদ তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। এ সংখ্যার শারহুল হাদীস, ফিকহ, আশুরা বিষয়ে প্রবন্ধ ও অনুভূতি তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমরাও প্রীত হলাম। গত মাসে তোমার তৈরিকৃত ইষৎ পরিবর্তীত শব্দকল্প ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। অনেকেই সমাধান পাঠিয়েছে আমাদের কাছে। এরকম নিত্য নতুন শব্দকল্প, বর্ণকল্প আগামীতে তৈরি করার আহবান রইল। পাশাপাশি প্রতিমাসে প্রকাশিত শব্দকল্প ও বর্ণকল্পগুলো দেখলে তোমার জন্য আয়ত্ত সহজ হবে।

বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ লিখতে পারো আন্দালিব ভাই সমীপে। অনুর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠিয়ে দাও parwanaafbd@gmail.com এই ইমেইলে।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ভারতে প্রথম মুসলিম অভিযানকারী কে?
২. ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান এর লেখক কে?
৩. ইমাম যাইনুল আবিদীন কত হিজরীতে ইন্তিকাল করেন?
৪. কাসিদায়ে বুরদা এর লেখক কে?
৫. বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

গত সংখ্যার উত্তর

১. আল কাসওয়া
২. দিওয়ানে ওয়াইসী
৩. ১৭৮০ সালে
৪. ৩০ বছর
৫. ১০ মুহাররাম ৬১ হিজরীতে

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মোহা. আব্দুল মান্নান, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট # **মো. আব্দুস সামাদ**, বাদে ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **মোহাম্মদ আজিজুর রহমান**, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **মোছা. ছাদিয়া জান্নাত উর্মি**, ঘাটপার, চরমহল্লা বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মো. শাহজাহান আলম**, আমতৈল, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম**, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # **মো. রইছ উদ্দিন**, পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # **হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া**, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ**, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # **হাফিয মিজানুর রহমান**, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # **হুসাইন আহমদ**, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # **মো. কামরুল হাসান**, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # **মো. জাবেল আহমদ**, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **মো. রাসেল আহমদ**, কুরবানপুর, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **তাহিয়াত মাহবুবা**, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # **আশিকুর রহমান**, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ**, নন্দিরগাঁও, সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট # **লায়েক আহমদ**, সিংচাপইড় ইসলামিয়া আলীম মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মুহাম্মদ আল আমিন**, কুমারকান্দি ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **সাইদুল ইসলাম মামুন**, সৎপুর দারুল হাদিস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # **মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী**, কমলগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার # **মাহমুদুল হাসান মারুফ**, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা।

শব্দকল্প

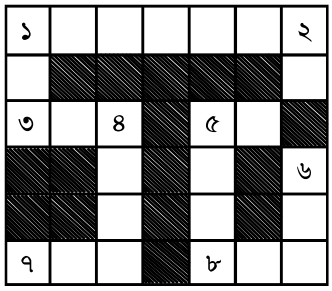

সূত্র : পাশাপাশি

১। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) কে দেওয়া ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এওয়ার্ড কর্তৃক প্রদত্ত উপাধী ৩। নয়া, নবীন ৫। সৌন্দর্যের প্রতীক ৭। বিচ্ছেদ ৮। ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ

সূত্র : উপর-নীচ

১। নম্র, মার্জিত ২। মায়ের ভাই ৪। নতুন যুগ ৫। সবজি বিশেষ ৬। কনিষ্ঠভ্রাতা

গত সংখ্যার সমাধান

কা	■	ব	ৎ	স	ল
র	ক্তা	ক্ত	■	ং	■
বা	■	ব্য	তি	ক্র	ম
লা	ই	■	র	ম	■
■	ত্যা	না	■	ণ	■
আ	দি	বা	সী	■	মা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মাহবুবুর রহমান সুজন

কালীকৃষ্ণপুর এস ই এস ডিপি মডেল হাইস্কুল, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপাশা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # জাছলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফনগর, মিরের চক, শাহপরাণ, সিলেট # ফৌজিয়া রহমান, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক, গিয়াসনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মুহসিনা জান্নাত তায়্যিবা, ছহিফাগঞ্জ এস. ডি দাখিল মাদরাসা, রহিমপুর, ইসলামাবাদ, বিশ্বনাথ, সিলেট # মুরশিদা জান্নাত তাসনিম, ইসহাক একাডেমি, রহিমপুর, ইসলামাবাদ, বিশ্বনাথ, সিলেট # মাছরুরা ইসলাম আদ্বহা, লতিফিয়া কিন্ডারগার্টেন, খাঁরপাড়া, ভাটেরা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # নাফিসা বিনতে ইমরান, পানিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানিগাঁও, রাখালগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

সংখ্যাকল্প

এ সংখ্যার ম্যাজিক

৮	১	৬
৩	?	৭
৪	৯	২

প্রতিটি কলামে একটি সমতা রয়েছে। বের করতে হবে প্রশ্নবোধক ঘরে কোন সংখ্যাটি বসবে?

গত সংখ্যার সংখ্যাকল্পের সমাধান

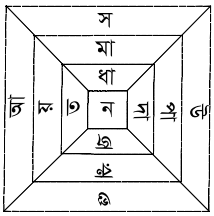

গত সংখ্যার পরিকল্পনাকারী

ফয়েজ আহমদ সাজিদ

জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সেনানিবাস, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

মাহমুদুল হাসান মারুফ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # সাইদুল ইসলাম মামুম, সেওতর পাড়া, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. রাজিয়া সুলতানা, শশারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার # সামির আল হাসান, বীরেন্দ্র নগর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # তাহিয়াত মাহবুবা, সম্রাট টাওয়ার-১, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # সাহরিন আক্তার হেপি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবুর রহমান বুলবুল, মুন্সির গাঁও, লামাকাজী, বিশ্বনাথ, সিলেট # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # আহমদ আল মায়রুফ, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. ফাহিম উদ্দীন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # রাহিন আহমদ সালেহ, দক্ষিণ রাইগদাড়া, ওসমানীনগর, সিলেট # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কালারুকা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # ফখর উদ্দীন, বাঁশখলা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মাহবুবুর রহমান বুলবুল, মুন্সিরগাও, লামাকাজী, বিশ্বনাথ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট # মো. শাহিন উদ্দিন, হযরত শাহ সদরুদ্দীন কুরেশী রহমতুল্লাহ হাফিযিয়া মাদরাসা, পিটুয়া, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রোমান আহমেদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাবিনা আক্তার ফাহমিদা, লতিফিয়া ইসলামিক একাডেমি, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোছা. রাবেয়া রহমান, চৌধুরী গাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. সাজ্জাদুর রহমান সাগর, টেককামালপুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. ওলিউল্লাহ, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

অদ্ভুত পৃথিবী

আজব গাছ

অতি প্রাচীনকাল থেকে মরুভূমির মানুষের কাছে অতি আজব এক গাছের নাম বাওবাব। গ্রীষ্মকালে যখন তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি তখন মরুভূমিতে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। মরুভূমির কিছু কিছু বৃক্ষ এবং ক্যাকটাস তাদের শরীরে পানি সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এই বাওবাব। এই গাছ এত পরিমাণ পানি ধারণ করে রাখতে পারে যা সাধারণত মানুষের চিন্তায়ও আসেনা। এর পানি ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১ লাখ লিটার। অর্থাৎ ১০০টি এক হাজার লিটার পানির ট্যাঙ্কে যত পানি ধারণ করা সম্ভব একটি বাওবাব গাছ সেই পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করে রাখতে সক্ষম। বাওবাব গাছের নয়টি প্রজাতি পৃথিবীতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ছয়টি প্রজাতি পাওয়া যায় মাদাগাস্কারে, আফ্রিকায় দুটি প্রজাতি এবং অস্ট্রেলিয়ায় একটি করে প্রজাতি পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে এই গাছকে বলা হয় বোতল গাছ। সাধারণত এই বোতল গাছ লম্বায় প্রায় ৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

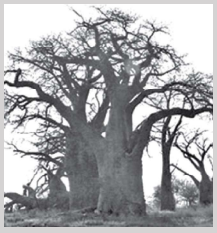

হাসতে জানি

উপহারের ভাগ

একবার মুল্লা নাসির উদ্দীন হোজ্জা বাদশাহর জন্য কিছু উপহার নিয়ে খাসমহলে যাচ্ছিলেন। গেটে প্রহরী হোজ্জাকে আটকে দিল। বলল, তোমার উপহার আমাকে দাও, আমিই জাহাঁপনাকে দিয়ে আসব। কিন্তু হোজ্জা নিজেই উপহার দিয়ে আসতে চান। এদিকে প্রহরীও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত হোজ্জা বললেন, ঠিক আছে, আমি ভিতরে গিয়ে বাদশাহর কাছ থেকে যা বখশিশ পাব, তার অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিব। একথা শুনে প্রহরী হোজ্জাকে ভিতরে যেতে দিল।

হোজ্জা দরবারে গিয়ে বাদশাহকে উপহার দেওয়ার পর বাদশাহ খুব খুশি হলেন এবং হোজ্জাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার কী চাই? হোজ্জা বলল ৫০ ঘা বেত্রাঘাত। দরবারের সবাই তো অবাক! এ কেমন উপহার চাওয়া? বাদশাহ যতই অন্য উপহার দিতে চান, হোজ্জা ততই বেতের বাড়ি নিতে চান। মহা মুসীবত! শেষ পর্যন্ত হোজ্জার জেদের কাছে হেরে গিয়ে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন হোজ্জাকে বেত মারার। ২৫ ঘা বেত মারার পর হোজ্জা থামতে বললেন। তারপর বাদশাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, জাহাঁপনা, আমার পুরস্কারের একজন ভাগীদার আছে। বাদশাহ জানতে চাইলেন, কে? তখন হোজ্জা দরবারে আসার পথে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। পুরো ঘটনা জানার পর বাদশাহ তখন ঐ প্রহরীকে ডেকে আচ্ছা বেত্রাঘাত করে তার পাওনা মিটিয়ে দিলেন।

বিচারকের কান কামড়ানো

বিচারক তার দরবারে বসেছেন। একদিন দু'জন লোক এল বিচার নিয়ে। একজনের অভিযোগ, আরেকজন তার কান কামড়ে দিয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি বলল, না হুযুর! ও নিজেই নিজের কান কামড়েছে।

বিবাদী বলল, তা কী করে সম্ভব! কেউ কি নিজের কান কামড়াতে পারে?

বিচারক দোটানায় পড়ে গেলেন। বললেন, আগামীকাল এসো। কাল এর ফয়সালা হবে। বিচারক বাড়ি ফিরে নিজের কান কামড়াতে চেষ্টা করলেন। লাফিয়ে নিজের কান মুখে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। একসময় উলটে পড়ে তার মাথা ফেটে গেল।

পরদিন বিচারক রায় দিলেন, ও নিজেই নিজের কান কামড়েছে। নিজে শুধু কান কামড়ানো যায় না মাথাও ফাটানো যায়।

*সংগ্রহে: **মিজানুর রহমান**, শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা*
সোবহানীঘাট, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০৯৬. আল আমীন তাহিন
পিতা: মুজিব উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শাহজালাল লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: উত্তর আলমপুর
ডাক: দরগা বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৯৭. আবু জাহের মারুফ
পিতা: মো. আকমল আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট সরকারি কলেজ
গ্রাম: উজান মেহেরপুর
ডাক: দরগা বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৯৮. মো. মাজিদুর রহমান
পিতা: মো. আমিনুল ইসলাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: তেতই গাঁও রশিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: দক্ষিণ ভানুবিল
ডাক: আদমপুর বাজার
থানা: কমলগঞ্জ
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৯৯. সাজেদুর রহমান আলামিন
পিতা: মো. ওয়ালিউর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বুদ্ধিমন্তপুর ফুরকানিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা
গ্রাম: ইসলামপুর
ডাক: বুদ্ধিমন্তপুর
থানা: সদর
জেলা: মৌলভীবাজার

৩১০০. মো. সজিব মিয়া
পিতা: সামছু মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী আজিজুর রহমান হাই স্কুল
গ্রাম: মীরেরগাঁও
ডাক: টুকের বাজার
থানা: জালালাবাদ
জেলা: সিলেট

৩১০২. শাকিল আহমদ
পিতা: মো. সাইকু মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মনসুর মোহাম্মদিয়া ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: কিয়াতলা
ডাক: কাদিপুর
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩১০৩. আহমদ মুনঈম জামী
পিতা: মাওলানা আব্দুল বাছিত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: নূতন বাজার দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: ধারণ
ডাক: ধারণ বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১০২. মো. ইমদাদুল হক
পিতা: মৃত আজিদুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা
গ্রাম: রায়সন্তোষপুর
ডাক: গোবিন্দগঞ্জ
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩১০৩. মো. আবীর আল নাহিয়ান
পিতা: কাজল হোসেন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: চারিগ্রাম
ডাক: আটগ্রাম
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩১০৪. মো. আলমগীর হোসেন
পিতা: মো. চাঁন মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভুকশিমইল আলিম মাদরাসা
গ্রাম: শশারকান্দি
ডাক: ভুকশিমইল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩১০৫. মরিয়ম আক্তার সোনিয়া
পিতা: মো. আপ্তাব উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: আলীনগর
ডাক: বরমচাল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে ‘শব্দকল্প’, ‘বর্ণকল্প’, সংখ্যাকল্প অথবা শিক্ষামূলক ‘ছোটগল্প’ ও ‘ছড়া/কবিতা’ লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই ‘আবাবীল ফৌজ’।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- ‘বলতো দেখি’র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

চিঠিপত্র

দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলে দেওয়া হোক

বৈশ্বিক মহামারি করোনা আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে একবারে ধ্বংসের ধারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। করোনা সংক্রমণের পর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এ সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে সরকার শিক্ষা ও পাঠদান ঠিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ঠিকই কিন্তু কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট সুবিধা নেই। আবার অনেকের জন্য ইন্টারনেট খরচ, মোবাইল ডিভাইস কেনারও সামর্থ নেই। বাস্তবতা হলো আমাদের শিক্ষাকার্যক্রমও কিন্তু এতোদিন প্রযুক্তি নির্ভর ছিল না তাই হুট করে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ার কথাও না, এবং হয়ও নি।সব র্পযালোচনায় পুরো একটি প্রজন্ম আজ অনিশ্চয়তায় দিন পার করছে, এভাবে চলতে থাকলে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই শিক্ষার্থীরা মনে করেন, যেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গার্মেন্টসসহ সব প্রতিষ্ঠান খোলা রয়েছে, সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা অযৌক্তিক।কেউ কেউ প্রশ্ন রাখেন, শপিংমল, গণপরিবহন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট,হাট বাজার অফিস আদালত সবই চলছে। তাহলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে দোষ কোথায়???

তাই শির্ক্ষাথীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে যে প্রক্রিয়াই হোক দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মধ্যে নিয়ে আসা হোক।

আলমগীর হোসাইন
শিক্ষার্থী, এমসি কলেজ, সিলেট

অনলাইনে দ্বীন শেখার বিষয়ে সাবধান থাকুন

যুগে যুগে অসংখ্য অগনিত বুযুর্গানে কিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ উপমহাদেশ তথা বিশ্বে ইসলামের সঠিক আকীদা কায়িম করেছেন। ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের নিকট পৌছাতে তারা হেঁটেছেন গ্রাম-শহরের অলিগলিতে। বর্তমানে সবকিছু ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় ইসলামের যাবতীয় খুটিনাটি বিষয় নিয়ে অনলাইন মাধ্যমে নানান ধরনের বিভ্রান্তিকর কুফরি আকীদা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইসলামের মূলধারা থেকে তাদেরকে বের করে বিভ্রান্তিকর শিরকী আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করানো হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, হঠাৎ করে একজন ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করে দিচ্ছে অথচ দ্বীনের বেসিক জ্ঞানটাও পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝে না। অনলাইনের তথাকথিত আলিমরাই নাকি ইসলামের হর্তাকর্তা সেজে গেছে। শরীআতের বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বলেন, অনলাইন থেকে ফাতওয়া ও দ্বীন শিক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। যদি ইসলামের নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে তা একজন বিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে জেনে নেবে। সর্বোপরি আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেনো অনলাইন নির্ভর ফাতওয়া ও দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ না করি। এসব বদ আকীদা শেখার মাধ্যমে নিজে তো গোমরাহ হবেই সাথে সাথে একটা বিশাল সংখ্যার কাওমকেও গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
শিক্ষার্থী, কমলগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার

Al ISLAH
CASH & CARRY

CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127